# তিনহাজার দুই

# তিনহাজার দুই

# তিনহাজার দুই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি ॥ কলকাতা-৯

'ন্না-ম্বা'

শ্রীশুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু

কপিলদেব ভূগর্ভস্থ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। মুখখানা খুব বিষণ্ণ। যতদূর চোখ যায় লম্বা প্ল্যাটফর্মে আর একজনও মানুষ নেই। তবে উল্টো দিকের ডাউন প্ল্যাটফর্মে আর একজন লোক পায়চারী করছে। তার হাতে একটা কুকুরের শিকল। শিকলে কুকুর বাঁধা নেই। শূন্য বকলশটা মেঝেতে গড়াচ্ছে। লোকটা শিস দিচ্ছে।

কপিলদেব লোকটার দিকে চেয়ে ছিল। লোকটা পাগল। এই তিন হাজার দুই খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে অবশিষ্ট মাত্র দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক লক্ষই পাগল। মাঝে মাঝে আরো পাগল হওয়ার সংবাদ আসছে। কপিলদেবের নিজের মাথাটাও আজকাল কেমন লাগে যেন। হাঁটছে, চলছে, কাজ কর্ম করছে, আর মাঝে মাঝে চমকে উঠে মনে হচ্ছে—আমি যা করছি সব স্বাভাবিক মানুষের মতো তো! পাগল হয়ে যাইনি তো নিজের অজান্তে!

ওপাশের প্ল্যাটফর্মের লোকটা কপিলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল—ও মশাই, শুনছেন?

—বলুন। কপিলদেব শান্ত গলায় বলল।

—বলুন তো কার গাড়ি আগে আসবে, আপনার না আমার?

—আপনার।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল—আপনার। বাজি?

কপিলদেব বিষন্ন হেসে বলে—আমার ট্রেন পাঁচটা দু মিনিটে, আপনার ট্রেন ঠিক পাঁচটায়।

লোকটা ভ্রু কোঁচকাল। বলল—বটে। ও। আমি অবশ্য গাড়ির সময় জানতাম না।

—আমি জানি।

লোকটা আবার কুকুরের চেন টানতে টানতে পায়চারী করতে লাগল। শিসে একটা খুব করুণ গান বাজাতে লাগল। একটু বাদে আবার মুখোমুখী এসে বলল—এখন কটা বাজে ?

ছটো প্ল্যাটফর্মেই বিশাল টেলিভিশন পর্দায় ঘড়ির ছবি ফুটে আছে। চুলচেরা সময়। এখন ঠিক পাঁচটা বাজতে আড়াই মিনিট বাকি। কিন্তু লোকটা সেদিকে তাকাচ্ছে না।

কপিল জবাবে প্রশ্ন করল—কোথায় যাবেন ?

লোকটা উদাস হয়ে বলে—কোথাও না। আমার সমুদ্রে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন ভাবছি, কি হবে গিয়ে ! সমুদ্রের ধারে বড় একা লাগে। আমার একটা কুকুর ছিল। সেটা কোথায় পালিয়ে গেল ! আমি কুকুরটার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আপনার গাড়ি এক্ষুণি আসবে।

—কিন্তু আমি কোথাও যেতে চাই না। আবার এখানে থাকতে চাই না।

কপিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারও মাঝে মাঝে এরকম হয়। কোথাও থাকতে ইচ্ছে করে না। কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না।

বিশাল দুই প্ল্যাটফর্মে মাত্র দুজন লোক। তারা দু দিকে যাবে। সামনে পিছনে আরো অন্তত চল্লিশটা প্ল্যাটফর্ম শূন্য খাঁখাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই। একটা স্পিকার কথা বলে উঠল হঠাৎ। ডাউন গাড়ি আসছে। সাবধান লাইনের কাছাকাছি থাকবেন না। আপনার

জীবন মূল্যবান—মনে রাখবেন, পৃথিবীতে মাত্র দশ লক্ষ লোক অবশিষ্ট আছে।

কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীতে দশ লক্ষ লোক এখন আর নেই। একটু আগে কপিলের কাছে খবর এসেছে একজন বুড়ো লোক মারা গেছে প্যারিসে। আর একজন আমস্টারডামে একটা চারশতলা বাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। পৃথিবীতে আছে মাত্র আর নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো আটানব্বই জন। বিনা মৃত্যুতে পনেরো দিন কেটে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ দু দুটো মৃত্যু বড় দুঃসংবাদ মানুষের কাছে। তবে সুখবর এই যে আগামী তিন মাসের মধ্যে আরো প্রায় ছাব্বিশটি শিশু জন্মগ্রহণ করার কথা। যদি তারা নিরাপদে জন্মায় তবে এ ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে যাবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা এই যে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার খবর আসছে। অনেকেই পৃথিবীর এই নির্জনতা সহ্য করতে পারছে না।

ওপাশের প্ল্যাটফর্মে উল্কার গতিতে ট্রেন ঢুকছে। ট্রেনটা অনেকটা লম্বা নলের মতো দেখতে। রং সাদা এবং কালো। কোনো শব্দ নেই। এই ট্রেনগুলি মাটি এবং সমুদ্রের তলা দিয়ে অবিরল পৃথিবী পরিক্রমা করে আসে। তাই ঐ ট্রেন কখনো আপ লাইন দিয়ে উল্টো দিকে আসবে না। কেবলমাত্র ডাউন লাইন দিয়ে পৃথিবী ঘুরে আসবে বার বার। মোট বিয়াল্লিশটা প্ল্যাটফর্মে এরকম অজস্র গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু লোক নেই।

কপিলদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উল্টো দিকে চেয়েছিল। পাগল লোকটার হাবভাব ভাল ঠেকছে না। যদি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে? করল না। গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলে গেল। কপিলদেব দেখল, লোকটা ওঠেনি কুকুরের চেন টানতে টানতে পায়চারী করছে।

বহুদূরের একটা প্ল্যাটফর্মে লাল রঙের ডাউন ট্রেন থেকে একটা মেয়ে নামল। সেদিকে তৃষিতের মতো চেয়ে রইল কপিলদেব। তার

ভাগ্য ভাল আজ স্টেশনে সে দু দুটো মানুষ দেখতে পেল। প্রায়দিনই একজনেরও দেখা পায় না।

আপগাড়ি আসবার খবর দিল স্পিকার। দু পা পিছিয়ে দাঁড়াল কপিলদেব। লালরঙের গাড়িটা রক্তমাখা তীরের মতো চলে আসে। দাঁড়ায়। কপাটগুলো খুলে যায় আপনা থেকে। কেউ নামল না। কপিল উঠল।

বিশাল গাড়ির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত টানা একটা হলঘরের মতো। নীলাভ উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সবুজ কুশনের চেয়ার খালি পড়ে আছে।

কপিল উঠতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটু দোল খেয়ে ট্রেন ছুটতে থাকে। কপিল একটা চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দেয়ালে একটা বোতামে চাপ দেয়। গাড়ির যেখানে জানালা থাকবার কথা সেখানে জানালার বদলে সারি সারি টেলিভিশন পর্দা লাগানো। কপিলের পাশের পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। কপিল ঘুরন্ত চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে সেদিকে মুখ করে বসল।

পর্দায় একটি মেয়েকে দেখা গেল। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু তাকে খুব অস্থিরমতি লাগছে। খবর পড়তে পড়তে মেয়েটি নিজের ঠোঁট জিভ দিয়ে বার বার ভিজিয়ে নিচ্ছে। নিজের অজান্তে ভ্রু কোঁচকাচ্ছে। মেয়েটি বলছে—দুটি মৃত্যু আমাদের কাছে আজ মর্মান্তিক। অন্যদিকে, কোনো জন্মের খবরও আজ নেই। আমরা দুঃখিত, পৃথিবীতে এই জনসংখ্যা হ্রাসের গতিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। বন্ধ করা যাচ্ছে না আত্মহত্যা। উপরন্তু এক লক্ষ পাগলের মধ্যে আজ আরো দশজনের নাম যুক্ত হয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে কারো মধ্যে আত্মহত্যার বিন্দুমাত্র প্রবণতা বা পাগলামীর সামান্যতম লক্ষণ দেখলেও আপনারা গণপ্রহরী কেন্দ্রে খবর দিন। সর্বশেষ হিসেবমতো, পৃথিবীতে গর্ভধারণ করবার ক্ষমতাসম্পন্ন নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র এক লক্ষের কাছাকাছি। সক্ষম পুরুষের

সংখ্যাও এক লক্ষের মতো। কোনো মহিলা সন্তান-সম্ভবা হলে তাঁকে জাতীয় সম্মান দেওয়া হবে···

কপিল টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। গাড়ির ছাদের গায়ে লাগানো সারি সারি আলোর চৌখুপী একটার পর একটা জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। অর্থাৎ, একটার পর একটা স্টেশনে থেমে গাড়ি চলছে।

পরের স্টেশনেই কপিল নামবে। মাত্র দশ মিনিটে সে প্রায় চারশো মাইল এসে গেল।

কপিল নামল। খাঁ খাঁ করছে স্টেশন। সে ধীর পায়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের একটা রেলিংঘেরা চৌখুপীতে দাঁড়ায়। চৌখুপীটা আস্তে ওপর দিকে উঠে যায়। একটা প্রকাণ্ড হলঘরের মেঝের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ায় সেটা। কপিল নেমে আসে।

হলঘরের বাইরে এসে বিকেলের আলোয় সে মস্ত শহরটা দেখতে পায়। আদিগন্ত আকাশপ্রমাণ উঁচু উঁচু বাড়ি। উত্তরদিকে শহরের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে বিশাল বুলডোজার দিয়ে। অজস্র শূন্য বাড়ি রেখে লাভ কি? সেগুলোয় পাখির আস্তানা, সাপখোপ কীট পতঙ্গের বাসা উদ্ভিদের জন্ম দেখা যাচ্ছে। ভেঙে ফেলাই ভাল। শহর ছোটো হলে অনেক ভাল লাগবে। এই বিশাল শহরে মাত্র দু হাজার লোকের বাস।

স্টেশনের বাইরে অজস্র গাড়ি দাঁড় করানো। সবুজ, মেরুণ, লাল, সাদা। প্রতিটি গাড়িই দেখবার মতো সুন্দর। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, টি-ভি আর টেলিফোন লাগানো, রাডার এবং কমপিউটার যন্ত্রে গাড়িগুলো চালিত হয়। শুধু স্টিয়ারিং ধরে থাকলেই হল।

কপিল গাড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। হাঁটতে লাগল।

ফুটপাথের ধারে ধারে দোকানঘর খোলা রয়েছে। খাবার, পোশাক, শৌখীন নানান জিনিস। দোকান নামে মাত্র। একটা জিনিসের জন্যও এক পয়সা ব্যয় নেই। আসলে পয়সা টাকা

ব্যাপারটাই এখন অপ্রচলিত। দশ লক্ষ লোকের জন্য এত অজস্র খাদ্য ও জিনিস রয়েছে যে কেনা বেচার প্রশ্নই ওঠে না। দোকানে দোকানদার নেই, ক্রেতাও নেই। কপিল আনমনে দোকানগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। একবার পিছু ফিরে দেখল। কেউ নেই। সামনে যতদূর চোখ যায়, কেউ নেই।

একটা ফ্লাইওয়ে ধরে অল্প একটু উঠেই কপিল দাঁড়ায়। দেখে। উত্তর দিকের শহরে চারটে বাড়ি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। এদিক থেকে শহর পতনের একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক শব্দ আসছে। সূর্য ডুবছে পশ্চিম ধারে। একটা বিশাল উঁচু ব্রীজের কানায় এখন লাল সূর্য লেগে আছে। একটা এরোপ্লেন পাখির মতো নিঃশব্দে ব্রীজের ওপর দিয়ে ঝোড়ো গতিতে উড়ে যায়। এইসব এরোপ্লেনে মানুষ নেই। শুধু ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি আছে। এরা উড়ে উড়ে মানুষের খবর নেয়। আকাশে অন্তত আট দশটা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখতে পায় কপিল। একটা উপগ্রহ খুবই বিশাল। প্রায় দুশো মাইল শূন্যের দূরত্বেও তাকে একটা নৌকোর মতো দেখাচ্ছে। ঐ উপগ্রহে প্রায় দশহাজার লোক বাস করতে পারে। এখন অবশ্য কেউ থাকে না। যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা গত শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব বেড়ে গিয়েছিল তখন অতিরিক্ত আবাস হিসেবে উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল শূন্যে। এখন বেশীর ভাগই খালি পড়ে আছে।

কপিল আনমনে আরো খানিক হাঁটল। তারপর রাস্তার পাশে একটা ঝকঝকে হুভারক্র্যাফট দেখে উঠে বসল।

বিশাল চওড়া রাস্তায় দু মিটার উঁচু দিয়ে কপিলের গাড়ি একশ বিশ ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকে। কোথাও ট্রাফিক জ্যাম নেই, কোনো লোক রাস্তা পেরোচ্ছে না। শুধু কিছু কুকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। কপিল একঝলক দেখল, এই চমৎকার শহরের রাস্তার একটা মাঝারি বড় সাপ রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।

কপিলের মুখে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীর হয়। প্রতিটি শহরেই প্রচণ্ড জঙ্গল সৃষ্টি হতে চলেছে। কিছুতেই অরণ্যের প্রসার ঠেকানো যাচ্ছে না। নিউ ইয়র্ক শহরের গভীর জঙ্গলে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে. মস্কোতে শ্বেত ভল্লুকের উপদ্রব। এই কলকাতার আশেপাশে মানুষখেকোর চলাফেরা।

বিশাল হাসপাতালের বাড়ির লবীর ভেতর কপিল তার গাড়ি দাঁড করায়। সাদা রঙে স্তম্ভহীন বিশাল সুন্দর ঘরখানা। কপিল দ্রুত পায়ে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যায়।

রিসেপশনে একজন মানুষ বিষণ্ণমুখে বসে আছে। তার পিছনে মস্ত একটা ইলেকট্রনিক বোর্ড। বোর্ডে সবার ওপরে যে খোপটায় আলো জ্বলছে তাতে লেখা মেটারনিটি—১। তার মানে, সন্তানসম্ভবা অন্তত একজন মহিলা এখানে রয়েছেন।

কপিল কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকে দাড়িয়ে বলে কুগী ভাল তো?

রিসেপশনের যুবকটি করুণ মুখ তুলে বলে—ভাল কি করে বলি? রুগীর হার্ট রিউম্যাটিক। শরীরে রক্ত নেই। হিস্টেরিক। বাচ্চা হতে গিয়ে যদি কোলাপস করে।

চিন্তিত কপিল বলে, ব্যবস্থা কি নেওয়া হচ্ছে?

—যতরকম নেওয়া সম্ভব। কিন্তু রুগী নিজেই সাইকোলজিক্যাল প্রেসারে দুর্বল। কিছু খেতে চায় না। সবসময়ে হ্যালুসিনেশন দেখছে। কেবল বলছে—পৃথিবীতে কেউ নেই। পৃথিবীতে কেউ নেই।

কপিল দাতে দাঁত ঘষে বলল—কিন্তু আমাদের পক্ষে আর একজন মানুষের ক্ষতিও সহ্য করা সম্ভব নয়। আজকের খবর শুনেছো? দুজন মারা গেছে এবং একজনও জন্মায়নি।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, জানি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কিন্তু ভয় হয়, এই রুগীর বাচ্চা যদি জন্মায়ও তবু হয়তো অ্যাবনর্মাল হবে।

কপিল বলল—আমি একটু দেখব।

—চলে যান।

কপিল রিসেপশন পার হয়ে ভিতরের দিকে যায়। ঢুকতেই একটা ঘর, তার ওপরে লাল আলোর অক্ষরে লেখা—জীবাণুমুক্তি কক্ষ। এখানে কপিলকে একটা সর্বাঙ্গ ঢাকা ওভারল পরতে হল। দাঁড়াতে হল একটা আলোর নীচে। এই আলো জীবাণু নাশক। প্রায় পাঁচ মিনিট আলোর স্নানে সর্বাঙ্গ জীবাণুমুক্ত করে তারপর ভিতরের দিকে দরজা খুলে কপিল করিডোরে পা দিল। কারিডোরে বিশুদ্ধ বাতাস রয়েছে। হাসপাতালের অভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে বীজাণু ও মলমুক্ত। একটিও পোকামাকড়ের অস্তিত্ব নেই। কোনো শব্দ নেই।

দীর্ঘ করিডোর পার হয়ে 'ডাক্তার' লেখা একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল কপিল।

দুজন সাদা ওভারল পরা ডাক্তার নিবিষ্টমনে রিপোর্ট দেখছেন। কপিল ঢুকতেই তাঁরা চমকে মুখ তুললেন।

কপিল বলল—কোনো খবর?

ডাক্তারদের মধ্যে প্রবীণজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। উনি একটু হেসে বললেন—কমপিউটারের বাচ্চা হতে এখনো বিশ দিন বাকি। তার আগে কোনো সুখবর দেওয়া অসম্ভব।

—রুগীর অবস্থা?

—কমপিউটার খুব ভরসার কথা বলছে না। এমন কি বাচ্চা হওয়ার আগেও রুগী একসপায়ার করতে পারে। রুগীর স্বামীও এজন্য ভীষণ নার্ভাস।

কপিল গম্ভীর চিন্তিত স্বরে বলে—একজন মানুষের রোগ হলে এখন দুনিয়ায় সবাই নার্ভাস হয়ে পড়ে ডাক্তার। প্রতিটি মানুষ এখন প্রতিটি মানুষের পরম সম্পদ।

প্রবীণ ডাক্তার বিষণ্নমুখে বলেন—আমরা জানি, একটা মানুষকে

বাঁচানো এখন একটা সাম্রাজ্য বাঁচানোর চেয়েও জরুরী। কিন্তু রুগী যদি নিজের জীবনের মূল্য বুঝতে না চায় তবে বড় মুশকিল।

—আমি রুগীকে দেখতে চাই।

তরুণ ডাক্তারটি উঠে বললেন—আসুন।

বাঁ দিকের করিডোর ধরে খানিকটা গেলেই রুগীর ঘর। মস্ত ভারী পাল্লা ঠেলে দুজনে ঢোকে।

ভারী বিস্ময়কর ঘরখানা। প্রথমে দেখলে একটি বাগান বলে মনে হয়। পায়ের নীচে দূর্বা ঘাস রয়েছে, ডানধারে একটি জলাশয়, চারধারে হাজার হাজার ফুলের গাছে ফুল ফুটে আছে। একটা বৌ কথা কও পাখি ডেকে উঠল। আকাশে ঝিক মিক করছে তারা, মস্ত চাঁদ উঠেছে। মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

জলাশয়ের ধারে একটা হেলানো চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। তার পায়ের কাছে উর্ধ্বমুখ হয়ে একজন পুরুষ।

কপিল কাছে এগোতেই পুরুষটি তাকাল। তারপর নিঃশব্দে হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। মেয়েটি কপিলের দিকে তাকাল না।

কপিল মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দেখল। বড় শীর্ণকায়া, সাদা এবং দুর্বল মহিলাটি তার দুটি বড় বড় ভাসন্ত চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

কপিল তার মথিত হৃদয় থেকে একটি শব্দ তুলে ডাকল—মা।

মেয়েটি ধীরে মুখ ফেরায়।

কপিল বলে—মা, কেমন আছেন?

মেয়েটি বিস্ময়ভারে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—তুমি কার ছেলে? আমার? আমার তো ছেলে হয়নি!

কপিল বলল—হবে মা। যেদিন হবে সেদিন সারা পৃথিবীতে আমরা উৎসব করব।

—কাকে নিয়ে উৎসব করবে বাবা? পৃথিবীতে কেউ নেই।

কপিল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ভয় কোরো না মা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে।

—বাড়ছে? মেয়েটি অবাক হয়ে বলে—কই—সারাদিন আমি মানুষ দেখার চেষ্টা করি। দেখতে পাই না তো। শহরের রাস্তা-ঘাট এত খাঁ খাঁ করে।

—একদিন রাস্তাঘাট আবার মানুষে ভরে যাবে। সেই অসহ্য আনন্দের দিন আসছে। সন্তান দাও মা। তোমার সন্তানের জন্য সারা পৃথিবী কোল পেতে আছে।

মেয়েটি দুকানে হাত চাপা দিল। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—আমার এই জ্যোৎস্না ভাল লাগছে না। আমি ভোরবেলার দৃশ্য দেখতে চাই।

তরুণ ডাক্তারটি দ্রুত পায়ে গিয়ে একটা গোলাপ ঝোপের আড়ালে সুইচবোর্ডে আঙুল ছোঁয়াল। আপনি আকাশের তারা নিভে গেল, চাঁদ মুছে গেল। চারদিকে জেগে উঠল পাখির কল-কোলাহল। ঘরের একধারে ঠিক ভোরের মতো সূর্য উঠত দেখা গেল। এ সবই কৃত্রিম। বাইরে দিনরাতের সঙ্গে এ ঘরের দিন রাতের কোনো সম্পর্ক নেই।

মেয়েটি ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে বলল—আমাকে মা বলে ডেকো না। আমার বড় ভয় করে। তোমরা এখন যাও, আমি ভোরের বেলাটা দেখি।

তিনজন পুরুষ নিঃশব্দে সরে আসে। তরুণ ডাক্তারটি আর একটি সুইচ টিপে দেয়। দেখা গেল, সাদা পোশাকের একটি নার্স দ্রুতপায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ আর্তস্বরে বলে ওঠে—ও মাগো।

কপিল দৌড়ে আসে।

—কি হয়েছে মা?

গর্ভবতী মেয়েটি খুব বড় বড় ভয়ের চোখে নার্সের দিকে তাকিয়ে

ছিল। অস্ফুট স্বরে বলল—একে কেন পাঠাও তোমরা? এ তো পুতুল! আমার কাছে সত্যিকারের মানুষ নার্সকে পাঠাতে পারো না?

কথাটা সত্যি। মানুষের অভাবে অবিকল মানুষের মতো দেখতে রোবোট দিয়ে আজকাল কাজ চালানো হয়।

কপিল নার্সের দিকে তাকাল। ফুট-ফুটে সুন্দর মুখশ্রী, হাসি-মাখানো ঠোট চোখে করুণা ঝরে পড়ছে। দু হাতে ধরা একটা ট্রেতে অনেক ফলমূল, খাবার, চা রয়েছে।

কপিলের দিকে চেয়ে নার্স বলল—আ—আমি আ—আমার ক—কর্তব্য ক—করছি।

যন্ত্রের কথাবার্তা এরকমই হয়। এখনো নিখুঁত হয়নি।

কপিল বলল—তুমি ট্রে রেখে চলে যাও। ওঁর সামনে বেশী আসবে না।

কলের নার্স মাথা নাড়ল। ট্রেটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে মানুষের মতো চমৎকার নির্ভুল পায়ে হেঁটে ফিরে গেল।

গর্ভবতী মেয়েটি কপিলের দিকে চেয়ে বলল—আমার কি একজনও মানুষ সঙ্গী জুটবে না সারাদিন? বড় একা লাগে।

কপিল তার নিজের ভিতরে রক্তক্ষরণ টের পায়। কান্না আসে।

তরুণ ডাক্তার আর একটি সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিকে ত্রি-স্তর কতগুলি ছবি ভেসে ওঠে। হঠাৎ দেখা যায় চারদিকের বাগানে, পুকুরের ধারে, রাস্তায় যেন হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা চেঁচায় হল্লা করে, ধাক্কাধাক্কি করে পথ হাঁটে। দেখা যায়, মেলা বসেছে। হাজারটা দোকানে লক্ষ মানুষের কেনাকাটা। ভেঁপুর শব্দ। সার্কাসওলার চিৎকার।

মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বলে—ঠিক এইরকম ইলিউশনের মতো একদিন যদি সত্যিকারের মানুষ দেখতে পেতাম!

কপিল বেরিয়ে আসে।

মেয়েটির ম্লানমুখ স্বামী বিষণ্ণ গলায় বলে—ওর জন্য আমিও ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আমার কিছু ভাল লাগছে না। বড্ড একা।

কপিলের মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। বেরোবার মুখে সে একটা টেলিফোন-টি-ভির সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টেপে। টেলিভিশনের পর্দায় তার ঘরের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। কপিল আকুল স্বরে ডাকে—শুভ্রা। শুভ্রা।

কিন্তু তার বৌ শুভ্রা সাড়া দেয় না।

অজানা আশঙ্কায় বুকটা ধক করে ওঠে কপিলের। সারাদিন শুভ্রা একা পড়ে থাকে বাসায়। কখন কি হয়।

—শুভ্রা! শুভ্রা! শুভ্রা। পাগলের মতো ডাকতে থাকে কপিল।

হঠাৎ টেলিভিশনের পর্দায় শুভ্রাকে দেখা যায়। বাথরুম থেকে সে বেরিয়ে এল। সারা গায়ে একটা মস্ত তোয়ালে জড়ানো। চোখ মুখ ভীত ত্রস্ত। সে কপিলের দিকে চেয়ে বলে—কি হয়েছে?

কপিল নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—কতক্ষণ ধরে ডাকছি। শোনো, আমার ফিরতে দেরী হবে।

—রোজই তো হচ্ছে।

—আমি টপ করে আমস্টারডাম থেকে ঘুরে আসছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব।

—কতকাল বাচ্চাগুলোকে দেখিনি। আজ ইচ্ছে ছিল দুজনে মিলে দেখতে যাবো ওদের।

কপিল বলে—বাচ্চারা ভাল আছে, চিন্তা নেই। আমস্টারডামে একজন আজ মারা গেছে।

—ওমা! তাই নাকি! কি হবে?

সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে ওঠে শুভ্রার গলায়।

কপিল মৃদুস্বরে বলল—বড় দুঃখের ঘটনা।

শুভ্রা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তারপর দেখা গেল তার চোখ টলটল করছে অশ্রুতে।

কপিল সুইচ টিপে পর্দা অন্ধকার করে দিল। তারপর একটা কাচের তৈরী শ্যাফটের ভিতরে একসপ্রেস লিফটে উঠল এসে। এক লহমায় লিফট তাকে হাসপাতালের একশ চল্লিশতলা ওপরের ছাদে নিয়ে এল। বিশাল ছাদে নানাদিকে মুখ করে গোটা পঞ্চাশেক ছোটো বড়, মাঝারি রকেট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকোণ করে রাখা আছে। কপিল একটা রকেটে উঠে যন্ত্র চালু করে দিল। মৃদু শিসের একটা শব্দ করে রকেটটা ঝাঁপিয়ে পড়ল দূরত্ব গ্রাস করে নিতে।

রকেটের পেটের মধ্যে ছোট্ট আরামদায়ক কেবিনে একটা জানালার ধারে বসে কপিল বাইরে চেয়ে রইল। নীচে কলকাতা পেরিয়ে গেল। মাঠঘাট প্রান্তর উড়ে যাচ্ছে। শহরের পর শহর। সব ফাঁকা, নিঃঝুম। কোনো কোনো ছোটো শহর, ঘন সবুজে আংশিক ঢেকে গেছে। ঘোর জঙ্গলে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে অধিকাংশ জনপদ। সমুদ্রে জাহাজ চলাচল নেই। অজস্র তিমি আর হাঙ্গর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কমপিউটার নিখুঁত দক্ষতায় রকেটটিকে চালিয়ে নিচ্ছে। বাতাসের বাধা গতিকে শ্লথ করে দেয় বলে রকেটটা প্রায় চল্লিশ মাইল ওপরে উঠে গেল। ওপর থেকে কপিল গোটা ভারতবর্ষের একটা আবছায়া বিশালত্ব দেখতে পায়। দক্ষিণে ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে গেছে দক্ষিণ। পূর্বদিকে আবছা আঁধিয়ার ছায়া-ছায়া হয়ে মুছে দিচ্ছে ভূ-প্রকৃতি।

নির্জন ইউরোপের ওপর খানিকক্ষণ উড়ে রকেট নামতে থাকে।

আমস্টারডামের হাসপাতালের মাথায় যখন নামল কপিল তখন মূল্যবান কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। এখানে এখন দুপুর। আকাশ মেঘলা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

নির্জন ছাদ পেরিয়ে লিফটে নেমে আসে কপিল।

লবীতে দুচারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা এতক্ষণ কপিলকে লিফট থেকে নামতে দেখে সবাই চিৎকার করে ওঠে—আরে। এসো এসো।

মানুষ দেখলেই সবাই আনন্দিত হয় আজকাল।

লবীতে একটা গাড়ি দাঁড় করানো। গাড়িতে কাচের কফিন। কফিনের ভিতর একটি মৃতদেহ অনেক ফুল দিয়ে ঢাকা। কপিল এগিয়ে গিয়ে কাচের ভিতর দিয়ে লোকটাকে দেখল। প্রৌঢ় লোক। ভাঙাচোরা মুখখানা যত্নে আবার যথাসাধ্য ঠিকঠাক করে দিয়েছে ডাক্তাররা।

কপিলের শ্বাস কাঁচের গায়ে একটা তাপের বৃত্ত তৈরী করল। একটু ফুঁপিয়ে উঠে কপিল বলল—ভাই। আমার ভাই।

যারা অপেক্ষা করছিল তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সবাই বলে ওঠে—ভাই আমাদের ভাই। গাড়ি চলতে থাকে। ধীরে হাসপাতালের চৌহদ্দী পার হয়ে চলে যায় কবরখানার দিকে।

শোকে মূক কয়েকজন মানুষ উজ্জ্বল আলোয় পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

একটা লম্বা লোক হঠাৎ বলল—বেঁচে থাকাটা যে আমাদের পক্ষে ভীষণ জরুরী সেটা মানুষ বুঝতে পারছে না কেন বলো তো।

কপিল উত্তর দিল না। বিকেলে সে আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্টেশনে মুখোমুখী প্ল্যাটফর্মে যে লোকটাকে দেখেছিল তার কথা বড় মনে পড়ছে তার। লোকটা পাগল। যদি সে লোকটা হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে।

একজন হঠাৎ বলে ওঠে—জর্জ বিয়ে করেনি।

কপিল জিজ্ঞেস করল—জর্জ কে?

—যে মারা গেল?

—বিয়ে করেনি?

—না।

লম্বা লোকটা বলল—ক্রাইম। যে নিজের সন্তান রেখে যেতে পারে না সে আজকের যুগের বড় ক্রিমিনাল।

প্রথম লোকটা বলল—সে তো ঠিক কথা। কিন্তু জর্জ বলত, তার

কোনো সেকস্যুয়াল আর্জ নেই। পৃথিবীর নির্জনতা তাকে এত হন্ট করত যে সে দেহের কোনো চাহিদা বুঝতে পারত না। সব সময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকত। বিয়ের কথা বললেই বলত—আমার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই।

কপিল দুই হাত মুঠো করে উত্তেজনায়, দুঃখে! পৃথিবীতে প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট নরনারীর মোট সংখ্যা মাত্র দু লক্ষের মতো। মহিলারা তাঁদের সাধ্যমতো সন্তান প্রসব করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জোর করে আর কিছু করা যাবে না। এই দুই লক্ষ নরনারীর সন্তানেরা মিলে বাকি আট লক্ষ মানুষ পৃথিবীতে। গড়ে প্রতিটি মহিলা আটটি করে সন্তান দিয়েছেন পৃথিবীকে। আর বেশী দাবী করা চলে না। তাঁরা ক্লান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য, আরো সন্তানবতী হতে গেলে অনেকেই প্রাণ হারাবেন। এ বছর শিশুদের মধ্যে মাত্র পঁচিশ হাজার ছেলেমেয়ে ষোলো বছর বয়স পার হয়েছে। ষোলো পার হলেই এখন দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। উপায় নেই, পৃথিবীতে এখন মানুষ বড় দরকার।

একটা মোটাসোটা বেঁটেখাটো আমুদে চেহারার লোক কপিলের কাছ ঘেঁসে এসে বলল—আমার বড় ভূতের ভয়, বুঝলে। আমি আজকাল প্রায়ই ভূত দেখছি। চলো, একটু কফি খাই।

কপিল লোকটার সঙ্গে হেঁটে রেষ্টুরেণ্টে এল। থরে থরে খাবার সাজানো রয়েছে। সেদিকে কেউ তাকালও না। একটা রাস্তার কুকুর খাবারের টেবিলে দু পা তুলে একটা স্টেক মুখে নিয়ে চলে গেল।

দুজনে কাগজের গ্লাসে পারকোলেটার থেকে কফি নিয়ে মুখোমুখী বসল। দূর থেকে বুলডোজারের শব্দ আসছে। শহর পতনের শব্দ।

কপিল বলল—এ শহরে কতজন আছে?

লোকটা শ্বাস ফেলে বলে—এক হাজারও নয়। কেবল ভূত আছে অজস্র। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?

—না।

—আমিও করতাম না।

কপিল হাসল।

লোকটা বলল,—ইয়ার্কীর কথা নয়। আমি ইনডোর স্টেডিয়ামে একদিন একটা রোবোটের সঙ্গে টেনিস খেলছিলাম। রোবোটটা এরাটিক। মাঝে মাঝে সহজ মার ফসকাচ্ছিল। খুব বিরক্তি লাগছিল। আসলে টেনিস খেলার তো এখন আর:কোনো আনন্দ নেই। স্টেডিয়ামে বসে কেউ দেখছে না, কেউ বাহবা দেবার নেই, এমন কি প্রতিপক্ষও একটি যন্ত্রমাত্র। সবই তো জানো। তবু আমি সময কাটানোর জন্য ব্যায়ামের জন্য খেলতে বাধ্য হই। কয়েকটা রোবোট বল-বয় আমাদের বল কুড়িয়ে দিচ্ছিল। খেলা চলছে। থার্ড সেটটাও আমার ফেবারে এসে গেল। শেষ গেমে রোবোটের সার্ভিস ভেঙে আমি যেই গেম, সেট আর ম্যাচ জিতেছি অমনি স্টেডিয়ামে একটা লোক হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু বিশ্বাস কর কেউ সেখানে ছিল না। আমি প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাই।

হঠাৎ রেস্টুরেন্টের দেয়ালে বিশাল টি-ভি পর্দায় ঝলসে ওঠে আলো। একটা কম্পিত গলা বলে ওঠে—দেয়ার ইজ এ ট্রেমর····তারপর চুপ। সাদা বোবা পর্দা।

উৎকণ্ঠ কপিল আর তার সঙ্গী কফি এবং ভূত ভুলে পর্দার দিকে তাকায়।

পর্দায় ঘোষকের উদভ্রান্ত মুখ ভেসে ওঠে। সে বলে—উত্তর আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডে প্রচণ্ড···প্রচণ্ড ভূমিকম্প হচ্ছে।

আমরা কি করব বুঝতে পারছি না। সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ লোক রয়েছে।

কপিল লাফিয়ে ওঠে। লোকটাও।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। হু-হুঙ্কার হাওয়া। ঝড়। কিন্তু

দেড় লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে কথা। কপিল বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে হাসপাতালের বাড়ির মধ্যে ঢুকল। পিছনে লোকটা।

সেই লম্বা লোকটা লবীতে একা দাঁড়িয়ে টি-ভি পর্দার দিকে চেয়ে আছে।

টি-ভির পর্দায় আবার ঘোষকের উদভ্রান্ত মুখ ভেসে ওঠে। একটু থেমে থেমে সে বলে যায়—আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ধরা পড়ছে, এই রাগী ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ক্রমশ সরে যাচ্ছে দক্ষিণে। এই রাগী ভূমিকম্প চার মিনিট ধরে সমস্ত দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। চল্লিশটি উপগ্রহকে আমেরিকার আকাশে পাঠানো হয়েছে। তারা যে দৃশ্যের ছবি পাঠাচ্ছে তা দেখুন।

বিশাল পর্দা জুড়ে কিছুক্ষণ সাদা আলো দেখা গেল। তারপরই ভেসে ওঠে শহরের ছবি। শহরের জমি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঁচু নীচু হয়ে আছে। বিশাল এক ফাটল থেকে অবিরল বাষ্পরাশি উঠে এসে গ্রাস করছে চারিধার। বাড়ি ঘর পড়ে আছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত মৃতদেহের মতো। ক্যামেরার লেন্স ক্লোজআপে তুলে আনে ধ্বংসস্তূপের খুঁটিনাটি। বেশী মানুষ ছিল না শহরে। তবু দুটি একটি হাত, পা, মুখ বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়। একটা একশ পঞ্চাশতলা বাড়ির ছাদে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যান্তর ঘটে. আর একটা শহরের ছবি আসে। একই দৃশ্য। শহর থেকে শহরান্তরে চলে যায় দৃশ্যগুলি। উড়াল রাস্তা ভেঙে পড়েছে, বাড়িঘর মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, পৃথিবীর অভ্যন্তর পর্যন্ত উন্মুক্ত করে বিশাল ফাটলের গহীন গহ্বর দেখা যায়। ধোঁয়া উঠে আসছে। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারিধার।

লম্বা লোকটা ডুঁকরে কেঁদে ওঠে হঠাৎ। চেঁচিয়ে বলে—ভগবান। এটা যেন আমার দুঃস্বপ্নমাত্র হয়।

বেঁটে লোকটা কপিলের হাত চেপে ধরে বলে—মানুষ কমছে। ভূত বাড়ছে। আমরা কোথায় যাবো বলতে পারো? বেঁচে থাকা বড় কষ্টকর।

কপিলের ভ্রূ অসম্ভব কোঁচকানো। মুখ থমথম করছে, অবরুদ্ধ কান্নায় চোখদুটো লাল, হাত পা থর থর করে কাঁপছে।

সে ফিস ফিস করে বলে—এরকম হওয়ার কথা নয়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ অনেক আগেই যন্ত্রে ধরা পড়েছিল নিশ্চয়ই। কেন সেটা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হল না?

লম্বা লোকটা দুহাতে মুখ ঢেকে মেঝের ওপর বসে ছিল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে নিজের কান্না গোপন না করেই বলল—মানুষ বড় অসতর্ক। বন্ধু, কেউই এখনও ভাল করে যন্ত্রের সঙ্কেত লক্ষ্য করে না। এই নির্জনতায় তারা অহরহ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

কপিল অন্যমনস্কভাবে পর্দার দিকে চেয়ে আছে। বীভৎস ধ্বংসের ছবি দেখে আর বিড় বিড় করে বলে—মানুষের প্রজাতি ধ্বংসের মুখে। ঠেকানো যাবে না। কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

টেলিভিশনের পর্দা থেকে স্বর ভেসে আসে—উত্তর আমেরিকার দিকে কেউ যাবেন না। সমস্ত রকেট ও উড়ো জাহাজের গতি পরিবর্তন করুন। আমাদের হিসেব মতো প্রায় এক লক্ষ মানুষ, আমাদের আত্মার এক লক্ষ আত্মীয়···গেছেন। যাঁরা প্রাণে বেঁচে আছেন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ইউরোপে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমাদের স্বয়ংচালিত যান ও যন্ত্র উদ্ধার কাজে নেমেছে।

বেঁটে লোকটা হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে নিজের পেট চেপে ধরে উপুর হয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—বেঁচে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই। লাভ নেই। এর চেয়ে ভূত হওয়া ঢের ভাল। ভূতের মৃত্যু হয় না। আমাকে মরতে দাও। আমাকে মরতে···

এই বলে হঠাৎ লোকটা ছুটতে থাকে দিকবিদিকের জ্ঞান হারিয়ে।

কপিলের মাথাটা ঝিমঝিম করে। মাথাটা ফেটে যেতে চায়। এক লক্ষ লোক নেই। অবিশ্বাস্য! দুহাত বার বার মুঠো পাকায় সে। দাঁতে দাঁত ঘষে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, বেঁটে লোকটা মরবার জন্য দৌড়োচ্ছে।

দুর্বলতাকে ঝেড়ে কপিল দ্রুত পায়ে লবীর বাইরে ছুটে যায়। লবীর মুখে একটা অদৃশ্য পর্দা রয়েছে। দরজার কাঠামোর ভিতরে লুকোনো রন্ধ্র দিয়ে অবিরল প্রচণ্ড এক বাতাস ছাড়া হয়। সেই বাতাসের পাতলা আস্তরণ ভেদ করে বাইরের কোনো পোকা-মাকড় আসতে পারে না।

ঠিক এই বাতাসের পর্দার মধ্যে দাঁড়িয়ে চিক্কন বাতাসের সুরসুরি সারা দেহে অনুভব করে কপিল। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখে রাস্তার চলন্ত ফুটপাত বেয়ে গভীর বৃষ্টিতে বেঁটে লোকটা ছুটে যাচ্ছে। রাস্তাটা ফ্লাইওয়ে। যে কোন সময়ে লোকটা এই প্রায় চল্লিশতলা সমান উঁচু রাস্তা থেকে রেলিং টপকে ঝাঁপ দিতে পারে।

মাথাটা ঝিম করে ওঠে কপিলের। বাঘের মতো সে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায়। চারদিকে অজস্র গাড়ি প্রয়োজনের অপেক্ষায় ছড়িয়ে রাখা। কিন্তু গাড়িতে ওঠা বৃথা জেনে কপিল ছুটতে থাকে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সে ভিজে যায়, চোখ ঝাপসা লাগে। বহুকাল সে ভেজেনি।

স্কাইওয়ে ঘুরে গেছে ডানদিকে। জনমানবহীন। অপরাহ্নের মেঘচাপা আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে জল। মেঘ ডাকে। কপিল প্রাণপণে রাস্তার চড়াই ধরে ছোটে।

বেঁটে লোকটা অন্তত একশ গজ সামনে চেঁচাচ্ছে—মরে যাও সবাই। মরে যাও। আমরা ভূত হয়ে বেঁচে থাকবো।

বলতে বলতে লোকটা ডান ধারের একটা ঢালু বেয়ে তীরের মতো নামতে থাকে।

কপিল দাঁড়ায়। এভাবে ওকে অনুসরণ করা অসম্ভব। ও পাগল। যা খুশী তা-ই করতে পারে। ওকে তাড়া করতে গিয়ে কপিল নিজে মারা পড়বে।

রাস্তার ধারে রাখা একটা বাতাসী নৌকো পেয়ে গেল কপিল। মুহূর্তের মধ্যে উঠে সে যন্ত্রটাকে চালু করে। কাচে ঢাকা ছোট্টো মোটরবোটের মতো দেখতে যানটি নিঃশব্দে শূন্যে উঠে পাখির মতো স্বচ্ছন্দে উড়তে থাকে।

কপিল জানে, বৃথা। এই দ্রুতগতি যানে লোকটার কাছে পৌঁছানোর আগেই ও ভালমন্দ কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তবু চেষ্টাই জীবন।

বাতাসী ভেলা সন্ধানী আলো ফেলে রাস্তায়। তারপর স্কাইওয়ে ছেড়ে তীব্র গতিতে শূন্যে নেমে যেতে থাকে। লোকটা অসম্ভব দ্রুতগতিতে ডানধারের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে নামছে। বৃষ্টিতে আবছায়া অশরীরী দেখাচ্ছে তাকে। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তায় তার শরীরটা দেখাচ্ছে পিঁপড়ের মতো ছোটো।

বাতাসী ভেলার গতি বাড়িয়ে দেয় কপিল। অন্তত দুশো মাইল বেগে রাস্তার সমান্তর ধরে ভেলা ছুটতে থাকে শূন্য পথে। তীক্ষ্ণ আলো ফেলে লোকটার ওপর।

লোকটা একবার তাকায় ভেলাটার দিকে। চীৎকার করে বলে —আমি থামতে পারছি না। আমাকে আটকাও।

কিন্তু আটকানোর উপায় কি ?

লোকটার মাথার ওপর দিয়ে ভেলাটাকে উড়িয়ে দেয় কপিল। তারপর লোকটাকে পার হয়ে সে ভেলাটাকে নামিয়ে আনতে থাকে রাস্তায়।

কিন্তু এত ওপরে বড্ড বেশী ঝোড়ো বাতাস। পাগলের মতো বাতাসের তোড় আর বৃষ্টির খরশান ঝাপটা। কিছুই প্রায় দেখা যায় না।

রাস্তার ওপর ভেলাটাকে নামিয়ে পিছু ফিরে চায় কপিল। বর্ষার নীচু মেঘ এসে রাস্তাটা গ্রাস করে নিয়েছে। ঘন কুয়াশার রেলগাড়ি বয়ে যাচ্ছে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

পায়ের শব্দের জন্য কান পেতে ছিল কপিল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না। আঁধার ভেদ করে লোকটাও বেরিয়ে এল না।

বাতাসী ভেলা আবার শূন্যে তোলে কপিল। ফিরে যায়। আঁতি পাঁতি করে রাস্তাঘাট খুঁজতে থাকে। আমস্টারডামের নিস্তব্ধ জনবিরল উঁচু রাস্তাগুলি থেকে শহরের ভিত পর্যন্ত। কোথাও নেই।

একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে অনুসন্ধান অফিসে খবরটা জানায় কপিল। বলে—লোকটাকে এক্ষুণি আটকানো দরকার।

অনুসন্ধান অফিস একটু অপেক্ষা করতে বলে কপিলকে. বলে —আমরা চারদিকে সন্ধানী রশ্মি পাঠাচ্ছি। কোথাও মৃত মানুষের দেহ থাকলে এক মিনিটের মধ্যে খবর দেবো আপনাকে।

একমিনিট অপেক্ষা করে কপিল।

তারপর অনুসন্ধান অফিস থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—একশ চোদ্দ নম্বর স্কাইওয়ের ওপর সে পড়ে আছে। কিছু করার নেই। মনে হয় একশ পনেরো নম্বর স্কাইওয়ে থেকে সে পড়ে গিয়েছিল।

কপিল বেরিয়ে এসে বাতাসী ভেলায় বসে। তারপর ধীরে ধীরে ভেলাটাকে মেঘের স্তরের ওপর তুলে উড়তে থাকে। নীচে চারদিকে কোপানো জমির মতো মেঘের রাশি। ওপরে নীলাভ আকাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলো। কপিল সেদিকে চেয়ে আছে। আপনমনে অনেকক্ষণ কাঁদে কপিলদেব। উত্তর আমেরিকায় এক লক্ষ লোক মারা গেছে। আমস্টারডামে এইমাত্র আরো একজন গেল।

একটা মস্ত বাড়ির মাথায় নেমে এল কপিল। এখানে রকেটের স্টেশন রয়েছে। দ্রুতগতি একটা রকেট বেছে নিয়ে পূবালী পথে নক্ষত্রের বেগে ছুটে চলল।

সারা রাত ধরে শহর পতনের শব্দ হয়েছে। তার শব্দনিয়ন্ত্রিত ঘরের জানলা খুলে অনেক রাত পর্যন্ত সেই শব্দ শুনেছে কপিল। শুভ্রাও অনেকক্ষণ জেগেছিল তার সঙ্গে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুভ্রা বলেছে আমাদের এত বড় আর সুন্দর শহর কিরকম ছোটো হয়ে এল।

অন্যমনস্ক কপিল জবাব দিয়েছে—আমরা ভেঙে না ফেললেও একদিন আপনা থেকেই ভেঙে যাবে। জঙ্গল এগিয়ে আসছে। বেড়ে যাচ্ছে ভয়াল সব জানোয়ার। দিল্লির জঙ্গলে অতিকায় বুনো হাতি দেখা গেছে। এরা কবে জন্মাল, কবে বড় হল আমরা জানতেই পারিনি।

—কি করে জানবো! শুভ্রা বলে—গোটা ভারতবর্ষের বিশাল অঞ্চল ফাঁকা পড়ে আছে; সেখানে কি হচ্ছে তোমরা কি করে খবর নেবে?

কপিল মাথা নাড়ে। বলে—সেইজন্যই আমরা শহর ছোট করে ফেলছি শুভ্রা। ছোট শহরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। গতকাল রাস্তায় আমি সাপ দেখেছি। কুকুরগুলোও ক্রমে বুনো প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের আকার বড় হচ্ছে।

কি হবে বলো তো।

—আরো একলক্ষ লোক চলে গেল শুভ্রা। পৃথিবীর মানুষ প্রজাতি বুঝি আর থাকে না। শুভ্রা, আর একবার মা হবে?

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল শুভ্রা। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর আস্তে বলল—আমি পৃথিবীকে দশটি সন্তান দিয়েছি। দশটি। আমার শরীরের সমস্ত প্রাণশক্তি নিংড়ে আমার সর্বশেষ সন্তান জন্মেছে মাত্র ছ মাস আগে। তোমরা আর কত চাও? আমার উর্বরতা কি অসীম? আমার ক্লান্তি নেই?

—জানি শুভ্রা তোমার বয়স মাত্র আঠাশ। গত বারো বছর ধরে তোমাকে এক নাগাড়ে সন্তান প্রসব করতে হয়েছে। তুমি ধন্য করেছ আমাদের। তবু বলি, ভেবে দেখ। এক লক্ষ্য মূল্যবান মানুষ আমরা হারিয়েছি।

—আমি পারব না। শুভ্রা মাথা নেড়ে বলেছে—আমি আর পারি না। আমার সাধ্য নেই। প্রাণ নিভে আসে। চোখ নিভে আসে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

শুভ্রা অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর সারা রাত ঘুমহীন কপিল বসে বসে নগরপতনের শব্দ শুনল। স্বয়ংক্রিয় বুলডোজার নির্ভুল যান্ত্রিক নিয়মে বাড়িঘর ভাঙছে, ধ্বংসস্তুপ তুলে নিচ্ছে ধাতব দাঁতে। সেগুলো গুঁড়ো করে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী করছে মণ্ড, সেই মণ্ড দিয়ে একদিন ছোটো শহরের চারদিকে দেয়াল তোলা হবে। মানুষ কমে আসছে, সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, আর শহর, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল চলে যাচ্ছে ভয়াবহ অরণ্যের কবলে।

ভোরবেলা কপিল একটা উৎক্ষেপণ রকেট ধরে আকাশের হাজার হাজার উপগ্রহের মধ্যে একটিতে এসে উঠল। উপগ্রহটি মাঝারি ভিতরে অন্তত পঞ্চাশজন লোকের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবী থেকে তিনশ মাইল উঁচুতে উপগ্রহটি সূর্যের পথে বিষুবরেখার ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে।

উপগ্রহের ইলেকট্রনিক, দূরবীক্ষণ আর ক্যামেরা নিয়ে বসে থাকে কপিল। গোটা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে দেখতে থাকে। দূরবীক্ষণে মাটির ওপরকার একটা ঢেলাও স্পষ্ট দেখা যায়। কপিল দেখে আর দেখে। নিউজিল্যাণ্ড জনশূন্য, অস্ট্রেলিয়া বিরল বসতি, আফ্রিকা গভীর অরণ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে।

যোগাযোগকারী আর একটি যান চালিয়ে ভিন্ন এক উপগ্রহে চলে যায় কপিল। অন্য কোণ থেকে পৃথিবীকে দেখে। দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে

উত্তর আমেরিকার আকাশে একটি স্থির উপগ্রহে বসে থাকে কপিল। এখানে এখন রাত্রি। অন্ধকারে কোথাও বিশাল অঞ্চল জুড়ে দাবানল জ্বলতে দেখা যায়। দু-একটা শহরে ক্ষীণ আলো জ্বলে।

টেলিভিশানের পর্দা জীবন্ত করে কপিল খবর শোনে। ঘোষক বলে—আমরা এখন আপনাদের মানুষের ছবি দেখাবো। আজকের নির্জন পৃথিবীর অধিবাসীরা দেখুন, পৃথিবীতে এক সময়ে কত মানুষ ছিল।

পর্দা জুড়ে ভীড়ের ছবি ফুটে ওঠে। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে পুরোনো আমলের শহরের ভীড় দেখতে পায় কপিল। পিকিঙের বাজার, টোকিয়োর ভূগর্ভস্থ রেল, কাশীর স্নানের ঘাট, নিউইয়র্কের খৃষ্টমাস উৎসব, কলকাতার দুর্গাপূজা, প্যারিসের নিউ ইয়ারস ডে! মানুষ আর মানুষ। কত মানুষ ছিল যে পৃথিবীতে। কলকাতার রাজপথের একটি বিজ্ঞাপনও দেখতে পাওয়া যায়—সীমিত পরিবারই সুখী পরিবার। ভেসে ওঠে সে আমলের এক খবরের কাগজের হেডিং—পৃথিবীর জনসংখ্যা অকল্পনীয় ভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপিল। তারপর স্থির উপগ্রহ ছেড়ে এক চলন্ত উপগ্রহ ধরে চলে আসে কলকাতার আকাশে। পৃথিবীগামী রকেটে করে নেমে আসে নিজের বাড়ীর ছাদে। মূল্যবান তিনঘণ্টা সময় নিয়ে সে পৃথিবীর যে চিত্র দেখল তা তাকে একটুও খুশী করেনি।

গৃহপালিত পশুকেন্দ্র থেকে কপিলের কাছে টি ভি টেলিফোনে ডাক আসে। কেন্দ্রের অধিকর্তা জান-এর ভয়ার্ত মুখ ভেসে ওঠে পর্দায়। সে বলে—কপিল একবার এসো।

—কেন?

—খুব জরুরী দরকার। গৃহপালিত পশুর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কপিলের সময় লাগল না। তৈরীই ছিল সে, ছাদ থেকে একটি মোটর-কপটার নিয়ে সে বেরোয়। চারশ তলা উঁচু ছাদের সংলগ্ন আকাশী পথ। এ পথ এত উঁচু যে মেঘ করলে ঢেকে যায়। কপিলের মোটর-কপটার যন্ত্রটি রাস্তা ধরে চলতে পারে, আবার রাস্তা না থাকলে কিছুক্ষণ উড়তেও পারে। গতি ঘণ্টায় চব্বিশ কিলো-মিটারের মতো।

আকশী পথ ধরে কপিল শহরের প্রান্তে আসে। এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে থামার বাড়ি অন্তত চারশ একর জমিতে কেবল পশু-খাদ্য তৃণের চাষ হচ্ছে। অন্যদিকে ফাইবার কাচের তৈরী গোশালা, মোষের আস্তানা, ছাগলের আবাস, ঘোড়ার আস্তাবল এবং হাস-মুর্গীর অতিকায় পোলট্রি।

মোটর কাপটার থেকে নামতে না নামতেই জান দৌড়ে এসে বলল, কপিল, পশুরা কোনো নিয়ম মানতে চাইছে না।

কপিল কথা বলল না। পশুকেন্দ্র তার চেনা। সে গিয়ে কাচ ঘরের দরজা খুলে ঢুকল। এখানে গরুকে খাওয়ানো হয় একটা বিশাল গোল যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন খোপে গরুদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মুখের কাছে থাকে একটা খাবারের পাত্র। সেই পাত্রে নল দিয়ে সঠিক ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার এসে জমা হয়। একই সঙ্গে গরুর ওজন, রক্তচাপ, এক্স-রে সব নিয়ে নেওয়া হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিনা আয়াসে দুগ্ধবতীদের দুধ টেনে নেয় এখান থেকেই।

কপিল ঘরে ঢুকতেই অনেকগুলি ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনে: ক্রুদ্ধ শ্বাসের শব্দ। এগিয়ে যায় যন্ত্রটার কাছে। একটা খোপের দরজা খুলতেই ভীষণ গলার শব্দ তুলে হুড়মুড় করে একটা প্রকাণ্ড কালো গরু বেরিয়ে আসে। গরুটার মুখে ফেনা, চোখ লাল, শ্বাস গভীর।

কপিল তাকিয়ে থাকে। গরুটা কপিলের মুখোমুখী দাঁড়ায়। তারপর মেঝেতে খুর ঘষে মাথা নীচু করে আচমকা ধেয়ে আসে।

কপিল বিনা আয়াসে দু পা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই গরুটা গা ঘেঁষে ছুটে খোলা দরজা দিয়ে গিয়ে ফাঁকায় পড়ে।

জান কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে—দেখলে ?

—দেখলাম। কপিল গম্ভীর জবাব দেয়।

—কি হয়েছে তাদের বলো তো !

কপিল চিন্তিতভাবে স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে গরুটাকে দেখছিল। তৃণভূমির ভিতর দিয়ে, চারণক্ষেত পার হয়ে গরুটা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে।

কপিল মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কিছু একটা টের পাচ্ছি জান।

—কি সেটা ?

—এসো, আরো একটু দেখি।

এই বলে কপিল গিয়ে একের পর এক দরজা খুলে দিতে লাগল। এতকাল যারা পোষ মেনে নিরীহের মতো দিন কাটাচ্ছিল সেই সব গরু মোষের আচরণে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এসে গেছে। হিংস্র, লালচোখো, ক্রুদ্ধশ্বাস গরু মোষ তাদের খোপ থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসে। তেড়ে ঢু মারবার চেষ্টা করে, তারপর চাপা হর্ষের ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। চারণভূমি পার হতে থাকে ঝড়ের বেগে।

মুর্গীর খাঁচা খুলতেই হিংস্র বন্য আনন্দে তারা ডেকে ওঠে। তীব্র ডানায় উড়ে যায় বাইরে। হাঁসের পাল দৌড়তে থাকে মাটি আঁকড়ে। ঘোড়া প্রচণ্ড হ্রেষায় চারিদিক প্রকম্পিত করতে থাকে।

জান বিস্ময়ভরে বলে—এ যে অবিশ্বাস্য কপিল! এরা সব যাচ্ছে কোথায় ?

কপিলের কপালে রেখা, সারা শরীরে ঘাম, চোখ ভয়ার্ত। সে একবার জান-এর দিকে চেয়ে বলল—তুমি কোনো গন্ধ পাচ্ছো জান ?

—না তো ! কিসের গন্ধ ?

কপিল মাথা নেড়ে বলে—আমিও পাচ্ছি না। কিন্তু একটা গন্ধ অবশ্যই আছে। আর ওরা সেটা টের পেয়েছে।

—কিসের গন্ধ কপিল ?

—আমার মনে হয় গন্ধটা জঙ্গল থেকে আসছে। জঙ্গলেরই গন্ধ। এসো।

এই বলে কপিল তার মোটর-কপটারে গিয়ে ওঠে। সঙ্গে জান। মোটর কপটার সামান্য গতিতে ওপরে উঠতে থাকে। কপিল তাকে শহরের প্রান্তের দিকে চালিয়ে দেয়।

বেশী দূর যেতে হয় না। হঠাৎ তারা দেখতে পায়, শহরের জনবিরল পূর্বদিকের গোটা এলাকা সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে। এই সেদিনও এখানে উদ্ভিদের কোনো আক্রমণ ছিল না। কিছু গাছ ছিল, কিছু ঘাস ছিল সাজানো বাগানের মতো। আজ এ কী! নিয়মহীন, উচ্ছৃঙ্খল আগাছা উঠেছে রাস্তা ভেদ করে। বড় বড় কংক্রীটের ইমারত ফাটিয়ে দেখা দিয়েছে গাছের অপ্রতিরোধ্য নিশান। লতানে গাছ ফ্লাইওয়ে বেয়ে উঠে আসছে। একটা বাড়ির ছাদ ছেয়ে গেছে বুক সমান ঘাসে। একটু দূরে, যেখানে ফাঁকা প্রান্তর ছিল সেখানে কালো মেঘের মতো ঘনিয়ে উঠেছে বিশাল মহাবৃক্ষের অরণ্য। নীচে পথ ঘাট ভেঙে পশু পাখিরা যে যার মতো চলে যাচ্ছে সেই মহারণ্যের দিকে।

—দেখেছো জান ?

—দেখছি। কিন্তু এর অর্থ কি ?

—আদিম পৃথিবী ঠিক ঐরকম ছিল। নিবিড়, ঘন মহারণ্য। ওরা একদিন সেই জঙ্গলের অধিবাসী ছিল। রক্তে তার স্মৃতি আজও রয়ে গেছে। আবার, সেই অরণ্যের দিন ফিরে আসে বুঝি জান! মানুষের প্রজাতি শেষ হয়ে এল। তাই নিবিড় আদিম অরণ্য ডেকে নিচ্ছে ওদের। ভেবো না জান। আমাদের আর খুব বেশী দুধ, মাংস বা ডিমের দরকার হবে না।

জান, বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা জল জন্মায় তার চোখে। সে মাথা নাড়ে। তারপর হঠাৎ হু-হু করে কাঁদতে থাকে।

কপিল তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে না। শুধু নীচের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে।

কপিল ভাবে, প্রকৃতি তার কত প্রিয় ছিল। এই বিপুল শহরে বাস করতে করতে কতবার তার ইচ্ছে হয়েছে, নিবিড় জঙ্গলের ধারে গিয়ে বাস করবে। যেতে ইচ্ছে হয়েছে নির্জন পাহাড়ে, সমুদ্রের ধারে জনবিরল গাছ পালার মধ্যে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে শীতে পাতা ঝরার সময়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে শেষ সূর্যের নরম আলো আর গাছের প্রলম্বিত ছায়ার আলো-আঁধারিতে ধীর পায়ে বেড়াবে। গাছে ও বাতাসে মর্মরধ্বনি ছিল তার প্রিয়, ভালবাসত সবুজ রঙের অনন্ত চিন্তার, ফুলের ফুটে ওঠা কি-অসীম আনন্দের সঞ্চার করেছে তার প্রাণে। আজও সে বলতে পারে না, অরণ্য তার প্রিয় নয়। কিংবা বলা যায় না যে, গাছপালাকে সে ভয় পায়। সেটা খুব মিথ্যে শোনাবে।

কিন্তু তবু ঐ এগিয়ে আসা মহা, আদিম, অন্ধ অরণ্যকে দেখে তার বুক কেঁপে ওঠে। মানুষের শহর, জনপদ, বসতি গ্রাস করতে নিঃশব্দ চকিত পায়ে এগিয়ে আসছে যে মূক নীরবতা তার ভিতরেই নিহিত আছে মানুষের সম্পূর্ণ পরাভব, তারপর বিলুপ্তি। খুব আদিম যুগে একদিন অরণ্যের দয়ায় মানুষ বেঁচে থাকত। তারপর ইতিহাস পাল্টে গেল, পৃথিবী জুড়ে জঙ্গল হাসিল করে মানুষ পত্তন করেছিল তার নগর-বন্দর। মানুস বাড়তে লাগল। জঙ্গল সরে যেতে লাগল দূরে। তখন ছিল মানুষের দয়ায় অরণ্যের বেঁচে থাকা। আবার আজ ইতিহাস পাল্টাচ্ছে। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অরণ্যের অমোঘ চিন্তায়।

—জান। কপিল মৃদু স্বরে ডাকে।

—আমি বেশিদিন বাঁচবো না কপিল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জান বলে!

– বাঁচতেই হবে জান।

—আমি ঐ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না।

কপিল মৃদু সম্মোহিত স্বরে বলে—এখনো প্রকৃতি বড় সুন্দর জান। চেয়ে দেখ, কী সবুজ! কী সবুজ! কতকাল দু চোখ ভরে এত সবুজ দেখিনি। মহা-অরণ্যের মধ্যে নিবিড় ঠাণ্ডা ছায়ায় কত প্রাণ জন্ম নিচ্ছে। পৃথিবীর মাটি যে উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছিল তা আবার ফিরে আসছে জান।

জান কথা বলল না। দু হাতে চোখ ঢেকে রইল।

শিশু-আবাসের চারধারে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা চমৎকার বাগান ছিল। ফোয়ারা ছিল, সাঁতারের কৃত্রিম পুকুর, খেলার মাঠ, ইস্কুল। চারদিকে নিরাপত্তার সুকঠোর ব্যবস্থা। শিশুরাই এখন মানুষের ভবিষ্যৎ শিশুরাই মানুষের পরমতম সম্পদ।

শিশু আবাসের মাঠে বাতাসী-ভেলায় করে নেমে এল কপিল আর শুভ্রা।

শুভ্রাকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। মুখের ভাবে একটা গভীর আতঙ্ক। কপিলের মুখে ভ্রুকুটি চোয়ালে শক্ত কঠিন নিষ্ঠুরতা।

শিশু আবাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ। তার মুখেও গভীর বিষণ্নতা। সে অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চেয়ে ছিল। কপিল আর শুভ্রাকে দেখে সামান্য নড়ল মাত্র।

—ফিলিপ। কপিল গভীর স্বরে ডাকে।

ফিলিপ একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে—কপিল. আমাদের বাগানের দিকে চেয়ে দেখ।

কপিল মুখ ফিরিয়ে দেখে।

যেখানে সুন্দর ফুলের কেয়ারী ছিল, সবুজ ছাঁটা ঘাসের মখমল ছিল সেখানে হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গজিয়ে উঠেছে অগণ্য উদ্ভিদ। সাজানো বাগান আগাছা আর মস্ত গাছের ভিড়ে ডুবিয়ে দিয়েছে কখন। চোরকাঁটায় ঘিরেছে খেলার মাঠ। লতায় লতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পাঁচিল। ফোয়ারার গা বেয়ে উঠে কংক্রীটে চিড় ধরাচ্ছে উন্মাদ লতানে গাছ।

ফিলিপ বলল—কালও আমরা জঙ্গল সাফ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বৃথা। গাছ গজাতে আজকাল সময় নেয় না। কপিল, আমাদের আশে পাশে আমরা বড় বড় জন্তুর চলাফেরার শব্দ পাচ্ছি আজকাল। বাঘের ডাক আসে। বুনো মোষের পায়ের শব্দ হরিণের ডাকের পিছু ধাওয়া করে।

শুভ্রা আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—আমাদের বাচ্চারা?

ফিলিপ ম্লান হেসে বলে—ভাল আছে শুভ্রা। বাচ্চাদের আমরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা ক'দিন!

শুভ্রা মৃগী রোগীর মতো দাঁতে দাঁত চেপে একটা অস্ফুট শব্দ করে। হাতের মুঠো পাকিয়ে বলে—আমাদের অস্ত্র আছে। মৃত্যুরশ্মি, ট্রেসার বুলেট, বিষের গ্যাস। আমরা সব বন্যজন্তু শেষ করে দেবো। স্বয়ংক্রিয় মেশিনে জঙ্গল মুড়িয়ে দেবো।

ফিলিপ ম্লান হাসে।

কপিল শুভ্রার হাত ধরে বলে—শান্ত হও। শোনো। আমাদের যা করবার সবই আমরা করব। করেছি। কিন্তু লড়াই কার সঙ্গে শুভ্রা? অরণ্যের সঙ্গেও নয়, বন্য-জন্তুর সঙ্গেও নয়। ওরা তো আমাদের আক্রমণ করে নি এখনো। আমাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, অবলুপ্তির সঙ্গে। মানুষ যেখানে নেই সে জায়গা তো অরণ্য দখল করবেই। সারা পৃথিবীতে মাত্র নয় লক্ষ লোক কি করতে পারে বলো! কত জায়গায় মানুষ থাকবে।

শুভ্রা বিভ্রান্তের মতো কপিলের দিকে চেয়ে বলল—আমরা উপগ্রহে গিয়ে যদি থাকি।

—কত দিন থাকবে? মাটির যোগাযোগ না রাখলে বংশ পরম্পর সেখানে বাস করা অসম্ভব। পৃথিবীতে মানুষের অভাব দেখা দেওয়ায় আমরা চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে, নেপচুনে আমাদের বসবাস বন্ধ করেছি। সেখান থেকে আমাদের উপনিবেশ গুটিয়ে আনতে হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকেও সব লোক এনে পৃথিবীতে বসতি বাড়াতে চেষ্টা করেছি। কারণ পৃথিবীর বাস উঠে গেলে গ্রহ বা উপগ্রহের উপনিবেশ ক'দিন থাকবে? তাদের সব রসদ তো পৃথিবী থেকেই নিতে হয়।

—তাহলে কি হবে আমাদের?

—অপেক্ষা করো।

কপিল আর কোনোদিকে তাকায় না। বিশাল শিশু আবাসের দরজা দিয়ে ঢুকে যায় ভিতরে।

এখানে কৃত্রিমতা খুবই কম। স্বাভাবিক ঘর দুয়ারের ভিতরে আসবাব অল্পই চোখে পড়ে। চারদিকে অগোছালো খেলনা, বই, জামা কাপড় ছড়ানো। এখানে অপার স্বাধীনতায় শিশুরা মানুষ হয়। তাদের ওপর কোনো কৃত্রিমতা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তারা দৌড়োয়. ভাঙে, ছেঁড়ে, পড়ে যায়, চেঁচায়, হল্লা করে, কেউ বাধা দেয় না। তাদের মনের স্বভাবজ আনন্দ কখনো কেড়ে নেওয়া হয় না, বাধা দেওয়া হয় না তাদের আচরণে। শুধু লক্ষ্য রাখা হয় তাদের নিরাপত্তা এবং পুষ্টির দিকে।

এখানে শিশু আবাসে খুব বেশী শিশু নেই। সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশজন। এরকম অজস্র শিশু আবাসে গত হাজার বছর ধরে শিশুরা বাস করছে। তাতে মা-বাবার কাজের সুবিধে হয়। বাচ্চারাও ঠিক মতো মানুষ হয়।

কপিলের এগারো বছরের বড় ছেলে কৌশিক সামনে এসে দাঁড়ায়। পরিপুষ্ট শরীর, অত্যন্ত বুদ্ধিমান মুখচোখ। সামান্য একটু হেসে বিনা ভূমিকায় বলল—বাবা, আমরা ছায়াপথের অন্য কোনো সৌরলোকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করিনি কেন ?

কপিল অবাক হয়ে বলে—তার কি কোনো দরকার ছিল ?

কৌশিক বলল—নিশ্চয়ই ছিল। পৃথিবীতে মানুষ ভীষণ বিপন্ন। আমি জানি।

—কে তোমাকে বলল ?

—আমি জানি।

কপিল শ্বাস ফেলে বলল—ছায়াপথের অন্য প্রান্তে কি মানুষের জন্য কোনো নিরাপদ গ্রহ আছে ?

—থাকতে পারে। খোঁজ নিতে দোষ কি ছিল ?

কপিল হাসল। বলল—মানুষের আয়ু কত জানো ? আলোর গতিতে ছুটেও ছায়াপথের কাছাকাছি কোনো সৌরলোকে পৌঁছোতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়। কিছু দূরত্ব আছে যা অনতিক্রমণীয়।

কিছুতেই তা পার হওয়া যায় না। মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে। পণ্ডশ্রম।

ছেলেটি এ কথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু কিছু বললও না।

শুভ্রা তার ছোটো মেয়েটিকে বুকে তুলে নিল। মেয়েটি অচেনা মায়ের কোলে উঠে প্রথমটায় হতবাক হয়, তারপর কেঁদে ওঠে। শুভ্রা তাকে ছেড়ে দেয় ফের। একটা শ্বাস ফেলে।

শ্বাসের শব্দে কপিল ফিরে তাকায়।

শুভ্রা সজল চোখে চেয়ে বলে—আমি আমার বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

—কোথায় নেবে ?

—আমার কাছে।

—সেটা তো নিয়ম নয়।

—এখন নিয়ম ভেঙে ফেলাই প্রয়োজন।

কপিল উত্তর দেয় না। ভ্রূ কুঁচকে থাকে কিছুক্ষণ।

ফিলিপ এগিয়ে এসে বলে—শুভ্রা, তুমি কোনোদিন শিশুদের যত্ন করার শিক্ষা পাওনি। গত সাত আটশো বছর ধরে শিশুরা কখনো তাদের মা-বাবার কাছে থাকেনি। বাচ্চাদের যদি নিজের কাছে নাও তো দু'দিনেই ওরা অযত্নে মরে যাবে।

শুভ্রা শুধু বলল—তবু।

কপিল মাথা নেড়ে বলল—তা হয় না শুভ্রা। আমরা কোনো দিন শিশুকে বড় করিনি। আমাদের কাছে রাখলে যদি ওদের কোনো ক্ষতি হয় ? এখন একটি মানুষের ক্ষতিও আমরা সহ্য করতে পারি না।

শুভ্রার সাদা মুখ আরো সাদা হয়ে গেল। সে বলল—শোনো, তোমরা শোনো। আমি টের পাচ্ছি আমার ভিতরে একটা আদর জন্মাচ্ছে। বড় ভীষণ সেই আদরের ক্ষিধে। সব সময় আদর করার জন্য আমাকে আমার একটা বাচ্চা অন্ততঃ ফিরিয়ে দাও। আমি

তাকে শুধু সারাদিন চুমু খাবো বুকে ধরে রাখবো। কাঁদবো হাসাবো।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ফিলিপ চেয়ে থাকে শুভ্রার দিকে।

তারপর কপিলের কানে কানে বলে—কপিল, পৃথিবীতে আর একটা পাগল বাড়ল।

কপিল উত্তর দেয় না।

শহর পতনের অবিরল শব্দ ভেসে আসে। ঘুরে ঘুরে যান্ত্রিক দাঁত গুঁড়িয়ে ফেলছে শহর। তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ চরণ ফেলে এগিয়ে আসছে বনভূমি।

কপিল অস্থির পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

একটা ভাসমান ঘন বাতাসের স্তরে শুয়ে আছে শুভ্রা। ঠিক মনে হয়, যেন শূন্যে ভাসছে ভৌতিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তা নয়। ঘণীভূত বাতাসের গদীর ওপর নিশ্ছিদ্র আরামে শুয়ে আছে শুভ্রা। ফোম রবারের চেয়ে বহুগুণে নরম আর স্পর্শহীন এই বিছানা। যতবার পাশ ফেরো, যতক্ষণ খুশী শুয়ে থাকো শরীরে কোনো ঘর্ষণ-জনিত অস্বস্তি হবে না। তপ্ত হবে না বিছানা।

কপিল শুভ্রার দিকে চেয়ে বলল—তুমি রাজি নও?

—আমি আর পারি না। আমি তো যন্ত্র নই।

—যন্ত্র হও শুভ্রা। শেষ শক্তি দিয়ে আর একবার মা হও।

শুভ্রা অকপট হতাশার সঙ্গে বলে—যদি হই তুমি তখনো আবার এমনি অনুরোধ করবে, কাকুতিমিনতি করবে। দশম সন্তানের বেলাতে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর আমাকে মা হতে বলবে না।

কপিল মৃদুস্বরে বলে—তখনো পৃথিবীতে বিশ লক্ষ লোক ছিল। গত এক বছরে এগারো লক্ষ কমে গেছে শুভ্রা। পরিস্থিতির বদল হয়েছে।

শুভ্রা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। যা হওয়ার তা হবেই।

—জানি। তবু আমাদেরও শেষবারের মতো চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একমাত্র কাজ, মানুষের চাষ। এর চেয়ে জরুরী কাজ আর কিছু নেই।

—আমি পারব না। ক্ষমা করো।

শুভ্রা, সন্তানধারণ কি এখন আর আগের দিনের মতো কষ্টকর? এখন কি প্রসব যন্ত্রণা বলে কিছু আছে? আমাদের অষুধপত্র আর চিকিৎসা কি সে সবের সমাধান করেনি?

—আমি প্রসবযন্ত্রণা কেমন তা জানি না। গর্ভধারণে কোনো শরীরের কষ্টও টের পাইনি কখনো। শুধু জানি, আমার শরীর থেকে কেবল একের পর এক শরীর জন্মায়। নিজেকে আমার অদ্ভুত লাগে। আমি যাদের জন্ম দিই তারা কেউ আমার থাকে না, তোমরা কেড়ে নাও। তাই বড় ক্লান্তি লাগে। অসম্ভব ক্লান্তি। তুমি বুঝবে না। আমার ভিতরে এক বিন্দু ইচ্ছেও অবশিষ্ট নেই।

কপিলের মুখ ভয়ংকর হতাশার ছাই মেখে নিল। ধীর পায়ে সে জানালার কাছে এল। দূরে যন্ত্রের শব্দ শুনল। একটা ফেউ ডাকছে কোথায়! সামনের উঁচু স্কাইওযে দিয়ে অসম্ভব দ্রুত পায়ে দৌড়ে গেল কয়েকটা বুনো কুকুর। কপিল হঠাৎ স্কাইওয়ের ওপরে একটা মস্ত হাতিকে হেঁটে যেতে দেখল।

ভয়ে চোখ বুজল কপিল।

ঘরের ভিতরে টেলিভিশনের পর্দায় সাদা আলো জ্বলে ওঠে। হাসপাতাল থেকে কপিলকে ডাকে সেই গর্ভবতী মেয়েটির স্বামী। বলে—কপিল, এসো শীগগীর।

তিন রাত ধরে কপিলের ঘুম নেই। চোখ বুজলেই আতঙ্কজনক স্বপ্ন দেখে। অবশ্য স্বপ্ন-রোধী বড় খেয়ে সে ইচ্ছে করলে নিবিড় ঘুমে ঘুমোতে পারে। কিন্তু ঐ কৃত্রিম ঘুম তার আর ভাল লাগে না।

শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। মনে হতাশা। চোখে জ্বালা। তবু কপিল ওঠে।

ছাদ থেকে মোটর-কপটার নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ইচ্ছে করেই কপিল যন্ত্রটাকে ওড়ায় না। আকাশী পথ ধরে চলতে থাকে। উজ্জ্বল আলোয় রাস্তা ঝকমক করছে। জনমানবহীন

হীন মরুভূমির মতো ফাঁকা। সেই নির্জন রাস্তায় একপাল হায়না হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।

কপিল অসম্ভব অবাক হয়। তার ধারণা ছিল, পৃথিবীতে হায়নার প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কয়েকটা শুধু বেঁচে ছিল বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়। তাহলে কোথা থেকে আবার জন্মাল এরা ?

স্কাইওয়ের চওড়া রাস্তার এক জায়গায় কপিল একটা অশ্বত্থের চারা গাছ দেখতে পায়। গাড়ি থামিয়ে সে নামে। ক্লান্ত পায়ে রাস্তার ধারে রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায়।

কংক্রীটে ছোট্ট একটু ফাটল। তাতে বুঝি কোনোদিন কোনো পাখি ঠোঁটে করে এনে ফেলে গিয়েছিল বীজ। সেই বীজ থেকে গাছ উঠে এসেছে। গাছের শিকড় চলে গেছে কংক্রীটের গভীরে। একদিন ফাটল বড় হবে। চিড় ধরবে আকাশী পথে।

গাছটাকে ছুঁলও না কপিল। লাভ কি ? মেঘের মতো চার দিক থেকে ঘনিয়ে আসছে অরণ্য। সে ক'টা গাছ উপড়ে ফেলতে পারবে ?

হাসপাতালে আসতে একটু দেরী হল কপিলের। আজ রিসেপশনে কেউ নেই। সম্পূর্ণ শূন্য অভ্যন্তর পেরিয়ে সে রুগীর ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।

মেয়েটি আগের দিনের মতোই বসে আছে জলাশয়ের ধারে। অত্যন্ত শান্ত মুখ। চোখে দূরের দৃষ্টি। নিজের চারপাশকে মেয়েটি যেন লক্ষ্যই করছে না।

স্বামী বেচারা অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে পায়চারী করছিল। কপিলকে দেখে ছুটে এল কাছে :

—কপিল, ও চলে যেতে চাইছে।

অবাক কপিল বলে—কোথায় চলে যাবে ?

স্বামীটি মাথা নেড়ে বলে—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো কপিল।

কপিল এগিয়ে যায়। সন্তর্পণে সে মেয়েটির সামনে গিয়ে কুণ্ঠিত পায়ে দাঁড়ায়।

—মা।

মেয়েটি তার দূরের চোখ অতি কষ্টে যেন কাছে ফিরিয়ে আনে। কপিলের দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কাঁপে। অস্ফুট স্বরে মেয়েটি বলে—অমি কারো মা নই। তুমি কে ?

কপিল হাঁটু গেড়ে সামনে বসে। মুখ তুলে, যেন প্রার্থনা করছে, এমন ভাবে বলে —মা, তুমি কোথায় যাবে ?

মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আমি যাবো।

—কোথায় যাবে মা ?

—আমি যাবো। আমাকে ডাকছে।

—কে ডাকে ?

মেয়েটি তার শীর্ণ হাত তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলে—ঐ ডাকে। শুনতে পাচ্ছো না ?

কপিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ও ডাক শুনো না মা।

মেয়েটি অসহায়ভাবে বলে—কিন্তু সব সময়ে ডাকছে যে ! কেবল ডাকে। ঝড়ের শব্দ পাঠায়। বাতাসে ভেসে আসে কেমন পাগল করা গন্ধ। ছায়া ডাকে। নির্জনতা ডাকে। মুক্তি দেবে বলে ডাকে।

—যেয়ো না মা। কপিল অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে—মহা অরণ্য তোমাকে ডেকে নিয়ে মেরে ফেলবে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—আমি যাবো। আমি একদিন ঐখানে ছিলাম।

কপিলের সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে ভয়ে। গায়ে রোমরাজি দাঁড়িয়ে যায় দু হাতে মুখ ঢেকে সে প্রবল কান্নার স্বরে বলে ওঠে—যেয়ো না। যেয়ো না। যেয়ো না।

মেয়েটি হঠাৎ তার শীর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে কপিলের মাথা স্পর্শ করে। শান্ত নিরুদ্বেগ আয়ত দুটি চোখ দিয়ে নিবিড়ভাবে দেখে কপিলকে। তারপর মৃদুস্বরে বলে আমরা ঐখানে ছিলাম। ওখানে ছায়া ছিল। নির্জনতা ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি করে কি

আশ্চর্য সুন্দর খেলার মতো ছিল জীবন। লক্ষ বছর আগে। চলো আবার ফিরে যাই।

মেয়েটির হাত মাথায় স্পর্শ করতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো শিহরিত হয় কপিল। তার ভিতরে যেন অবিরল ভেঙে পড়ে যেতে থাকে এতকালের অভ্যস্ত জীবন সংস্কার। তার ঘ্রাণে এক নিবিড় আশ্চর্য বনের গন্ধ ভেসে আসে। তার শ্রবণে মর্মরধ্বনি তোলে গাছে বাতাসের মর্মরধ্বনি। সে দেখতে পায় হাজার হাজার বছরের পুরোণো বিশাল আকাশপ্রমাণ গাছের কালো ছায়ার নীচে মাটিতে পুরু শ্যাওলা পড়েছে। পিছল পথে ঝর্ণার জলের শব্দ লক্ষ্য করে সে চকিত চটুল পায়ে হেঁটে যাচ্ছে পথের গন্ধ শুঁকে শুঁকে। তার গা নিরাবরণ, হাতে পাথরের অস্ত্র।

এক ঝাঁকিতে উঠে দাঁড়ায় কপিল। রক্তের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা অরণ্যের স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে সে। আর্তস্বরে বলে ওঠে—না। এ কখনো হতে পারে না।

শীর্ণ মেয়েটি অরণ্য বালিকার মতো অনাবিল হেসে ওঠে। বলে—কোথায় পালাবে তুমি ?

কপিল উগ্রকণ্ঠে বলে—পালাবো না। জিতব।

মেয়েটির দুই চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। নিজের স্ফীত পেটে একটি সতর্ক হাত নরম করে রেখে বলে—আমার সন্তান আমি ওকে দেবো।

—কাকে ?

—ঐ, যে আমাকে ডাকে।

—কেন মা ?

—ও একদিন তো নেবেই সব শিশুকে।

—কি করে নেবে ?

—যখন শিশুদের সব বাপ-মাকে মেরে ফেলবে ও, তখন নেবে। দেখো। একে একে সব বয়স্ককে মেরে ফেলবে।

অস্থির কপিল সরে আসে মেয়েটির চোখের সামনে থেকে।

মেয়েটির স্বামী বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চিন্তাশূন্য, বিভ্রান্ত হতবাক।

কপিল তার কাঁধে হাত রাখল। নরম স্বরে বলল—ওকে ঠেকাতেই হবে।

স্বামী মাথা নেড়ে বলে—কি করে ঠেকাবো কপিল? চারিদিকে কেবলই পায়ের শব্দ হয়। হাসপাতালের লবীতে একটু আগেই আমি একটা হনুমানকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। সে আমার দিকে হিংস্র চোখে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। কুকুরের ডাক শুনি, কিন্তু আগের মত ডাক নয়। এখন কুকুরেরা খুব অন্যরকম স্বরে ডাকে। শুনলে ভয় হয়।

—আমি জানি।

—টের পাচ্ছি আমাদের চারিদিকে এক শব্দহীন ষড়যন্ত্র। ও যদি যায় তবে কি করে ঠেকাবো?

কপিলের মুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে ওঠে। সে গিয়ে ঝোপের আড়ালে বোতাম টিপে ধরে।

অমনি সেই সাদা পোশাকের নার্স মেয়েটি ছুটে আসে। কলের মানুষ নার্সটিকে অবিকল মানুষের মতো দেখায়।

রোবট নার্স বলে—য-যথা আ-আজ্ঞা।

কপিল এই বিশ্বস্ত কলের পুতুলের দিকে চেয়ে বলে—তোমাদের সবাইকে নিয়ে এসো। এ মেয়েটিকে পাহারা দাও। দেখো, এ যেন চলে যেতে না পারে। কেউ যেন আসতেও না পারে এর কাছে।

নার্স বলে—তা-তাই হ-হবে।

বলে চলে যায়। একটু বাদেই প্রায় পঞ্চাশটা কলের পুতুল চলে আসে। তারা সারি দিয়ে চারিদিকে দাঁড়ায়।

নার্স পুতুল কপিলকে বলে—আ-আমরা য-যথাসাধ্য ক-করব। আ-আর কি-কিছু আ-আদেশ আ-আছে?

কপিল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল—না।

গর্ভবতী মেয়েটি সম্পূর্ণ অন্যমনে বসে চেয়েছিল দূরের দিকে। তার ঘরের একটা দেওয়াল সরানো রয়েছে। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বহু দূরের বিস্তার। নীল আকাশ, আকাশকে ছুঁয়ে কালো মেঘের মতো ঘনায়মান গাছপালা।

ঘরের মধ্যে উড়ে এল একটা চন্দনা। চারদিকে অশ্রান্তডানায় পাখিটা ওড়ে আর এক অদ্ভুত স্বরে পাখিটা ডাক দেয়।

কপিল অবাক হয়। ঐ ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে পাখি আসবার কথা নয়। দেয়াল সরানো ঐ জায়গায় প্রবল বাতাসের একটি পাতলা পর্দা রয়েছে। সেই পর্দা ভেদ করে কীট পতঙ্গ কেউই আসতে পারে না। তবু কি করে যেন পাখিটা এসেছে!

গর্ভবতী মেয়েটি হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর চারদিকে চায়। সে দেখতে পায়, তাকে ঘিরে পুতুল মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক পলক বিস্ময়ভরে শীর্ণকায় মেয়েটি দৃশ্যটা দেখে। তারপর হঠাৎ শরীরের সব দুর্বলতা নির্মোকের মতো ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়। প্রথমে অস্ফুট একটা শব্দ করে। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ছুটে যায় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে।

সে চেঁচিয়ে বলে—হো আ! হো আ! হো আ!

কপিল কাঠ হয়ে যায়। মেয়েটি এ কোন্ ভাষায় চিৎকার করছে? এ তো সভ্য মানুষের ভাষা নয়! এর তো কোনো অর্থ নেই! এ কার ভাষা কবে শিখল ও?

মেয়েটি বলতে থাকে—আ! হো আ-আ। হো আ! আ!

পুতুলেরা দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ়ভাবে। হাত বাড়িয়ে শৃঙ্খলা রচনা করে। একজন পুতুল গিয়ে মেয়েটিকে জোর করে বসিয়ে দেয় চেয়ারে।

মেয়েটি তার সেই আদিম ভাষাহীন চিৎকার পাঠাতে থাকে চারিদিকে। পাখিটা ঘুরে ঘুরে তার উঁচু মিঠে স্বরে অবিরল ডাকতে

থাকে। বাইরে থেকে এক গভীর বাতাসে ভেসে আসে অরণ্যের গম্ভীর মর্মরধ্বনি।

•

ভূগর্ভস্থ স্টেশনে দাঁড়িয়ে টেলিভিশনের পর্দার দিকে চেয়েছিল কপিল। নিজের চোখ-কানকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না আজ।

পর্দায় একটি ছেলের মুখ ভেসে উঠেছে। ছেলেটি কাঁপা স্বরে বলে—ফ্লাশ।

কিছুক্ষণ চুপ। পর্দা সাদা হয়ে যায়।

ছেলেটির মুখ আবার ভেসে ওঠে পর্দায়। ছেলেটি বলে—ঝড়। এরকম ঝড় আর কখনো হয়নি। ইউরোপে! রক্ষা কর।

পর্দা সাদা হয়ে যায়।

তারপরই কোনো উপগ্রহ থেকে স্বয়ংচালিত যন্ত্র ঝড়ের দৃশ্যটা ধরে পর্দায় ফেলতে থাকে।

চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না কপিল। সে দেখতে পায় একটা ধোঁয়াটে আবর্ত গোটা সমুদ্রকে যেন তুলে আনছে ভূখণ্ডে। পাহাড়প্রমাণ জলস্তম্ভ এগিয়ে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়াটে ঘূর্ণীঝড় শহর থেকে মুঠো মুঠো যানবাহন তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দিকবিদিকে। বাড়িগুলো দুলছে, হেলছে. মড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছে বড় গাছের মতো।

সে চোখ বুজে ফেলে। তার গা বেয়ে এক সর্পিল বিবমিষা উঠে আসতে থাকে।

হঠাৎ সে একটা শিসের শব্দ শুনতে পায়। সুরহীন অদ্ভুত শিস।

টি-ভির পর্দা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে তাকায়। দেখে আজও উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে সেই লোকটা পায়চারী করছে। হাতে শিকল।

লোকটা তার দিকে চেয়ে বলে—ক'টা বাজে?

কপিল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।. অনেক কষ্টে সে হাত তুলে ঘড়ির ছবিটা দেখিয়ে দেয়।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমি ঘড়ি দেখে কিছু বুঝতে পারছি না। অক্ষরগুলো বড় অচেনা।

অতি কষ্টে কপিল উচ্চারণ করে—পাঁচটা বাজতে দু মিনিট।

—আমার গাড়ি কখন ?

—আজ গাড়ি আসবে না।

—কেন ? লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—ওটা উত্তর আমেরিকার ভিতর দিয়ে আসা লাইন। ভূমিকম্পে সেখাকার লাইন ধসে গেছে। গাড়ি বন্ধ।

লোকটার মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে - বাঃ বাঃ চমৎকার খবর। আমি এই খবরটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

—কেন ?

—আমি গত সাত দিন ধরে এইখানে পায়চারী করে যাচ্ছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ি আসছে, চলে যাচ্ছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার কোথাও যাওয়ার কথা। কোথাও আমাকে যেতেই হবে। যতবার গাড়ি আসে ততবার মনে হয় আজ বুঝতে পারলাম, আমার কোথাও যাওয়ার নেই। এখন আমি আমার কুকুরটাকে খুঁজতে যাবো

তোমার কুকুর কোথায় গেছে ?

লোকটা মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—কী জানি! সে আমার অত্যন্ত বাধ্য পোষা কুকুর ছিল। আমি যা বলতাম তা-ই করত। একদিন কুকুরটাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে যাবো বলে আমি এইখানে গাড়ি ধরতে আসি। হঠাৎ শিকলে প্রচণ্ড টান। চমকে দেখি, আমার কুকুরটা শিকল ছিঁড়বার জন্য প্রচণ্ড লাফালাফি করছে। তাকে ধমক দিলাম।

শুনল না। মারলাম। সে কামড়ে দিতে এল। তাই ভাবলাম, ছেড়ে দিই। আমার প্রিয় কুকুর ঠিক আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। বকলশ থেকে শিকলের হুক খোলামাত্র সে একটা অদ্ভুত ভীষণ ডাক ছেড়ে ছুটে কোথায় চলে গেল। গেল তো গেলই। আর এল না। ঐ সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠে গিয়েছিল। আমিও দৌড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। অনেক খুঁজেও তাকে কোথাও পাইনি। সেই থেকে আমি এই প্ল্যাটফর্মে তার জন্য অপেক্ষা করছি। সে না এলে আমি কোথাও যেতে পারছি না। আমার বড় প্রিয় কুকুর। তাকে ফেলে যাই কি করে? গাড়ির পর গাড়ি চলে যাচ্ছে, আমি কোনো গাড়িতেই চড়তে পারছি না। যদি চলে যাই তবে সে হয়তো এখানে আমাকে খুঁজতে এসে ফিরে যাবে। অনবরত শিস দিয়ে তাকে ডাকছি।

কপিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—এখন কি হবে?

লোকটা খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল—আমি আর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করব না। আমি এবার নিশ্চিন্তে আমার প্রিয় কুকুরটার খোঁজে বেড়িয়ে পড়ব। যদি তাকে খুঁজে পাই তবে এরপর থেকে সে যেখানে থাকতে চাইবে সেখানেই থাকব আমি। সে যা করতে বলবে করব।

এই বলে লোকটা তার জামা খুলে ফেলল। পরিধান সবই ফেলে দিল বাহুল্য বোঝার মতো। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সে একবার কপিলের দিকে চেয়ে হাসল। কোনো কথা বলল না।

তারপর শিস দিতে দিতে সে এসকালেটার বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

ফিরতে কপিলের কিছু রাত হল আজ! ঘরের জানালার কাছে আকাশী ভেলাটা দাঁড় করাতেই শুভ্রা উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসে। চেঁচিয়ে বলতে থাকে— ওগো, শিশু-আবাসের কেউ সাড়া দিচ্ছে না কেন? সাড়া দিচ্ছে না কেন ওরা? আমি সারাদিন ধরে কতবার ফিলিপকে ডেকেছি।

ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এসেছে কপিলের শরীর। তবু সে তার জ্বালাধরা চোখে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বলে—উঠে এসো শুভ্রা। চলো, দেখি।

কয়েক পলকে আকাশী ভেলাকে শিশু-আবাসের বাগানে এনে ফেলে কপিল।

প্রথমে তারা বাগানটাকে চিনতেই পারে না। ঘন জঙ্গলে গোটা বাগান আর বাড়ি ছেয়ে গেছে। কত অজানা লতা আর আগাছা আর গাছ লসলসিয়ে উঠেছে। বনজ গন্ধে ভারী বাতাস।

শুভ্রা ভেলা থেকে নেমে ছুটে যায় ভিতরে। আর্তস্বরে চেঁচায়—ফিলিপ! ফিলিপ! আমার বাচ্চারা কোথায়?

কেউ উত্তর দেয় না।

কপিল মৃদু পায়ে এসে শিশু-আবাসের দরজা দিয়ে ঢোকে। দরজা আচ্ছন্ন করে লতানে গাছ উঠেছে। তাতে ফুল ফুটেছে অনেক। ঘরের মেঝে ছেয়ে গেছে লতায় পাতায়। দেয়ালে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। মেঝে থেকে একটা কালো সাপ হঠাৎ ফণা তোলে। তার শ্বাসের শব্দে বাতাস শিউরে ওঠে।

শুভ্রা সাপটার ছোবলের নাগালে দাঁড়িয়ে চারদিকে বিহ্বলভাবে তাকাচ্ছে। লক্ষ্যও করছে না সাপটাকে।

কপিল তার কোমর থেকে রশ্মি-যন্ত্রটা খুলে নেয়। সাপটাকে লক্ষ্য করে বোতাম টিপে ধরে। অদৃশ্য রশ্মিতে সাপটা পলকে ছাই হয়ে যায়। আশেপাশে কুঁকড়ে যায় কয়েকটা গাছের পাতা।

শুভ্রা তার অদ্ভুত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—কোথায় ওরা?

কপিল মাথা নেড়ে বলে—জানি না।

—কোথায়? বলো! শুভ্রা চিৎকার করে ওঠে।

কপিল ফিসফিস করে বলে—ওদের ভাল হোক।

শুভ্রা কপিলের সামনে এসে হঠাৎ দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাকে। মুখমণ্ডল ভেসে যায় চোখের জলে তার। সে অগাধ কান্নায় ভেঙে

পড়ে বলে—ওগো ফিরিয়ে দাও। আমি যে কখনো তাদের ভাল করে আদরও করিনি।

কপিল বনজ গন্ধটা পায়। বড় অস্বস্তি। এত তীব্র গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না। সে শুভ্রাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে টেনে আনে বাইরে। গাছপালা থেকে কতকগুলো হনুমান ব্যাঙের শব্দ করে ওঠে।

কপিল দৌড়ে আসে আকাশী ভেলার কাছে। দেখতে পায় একটু সময়ের মধ্যেই কখন দুটো দড়ির মতো লতা ভেলার গা আঁকড়ে ধরেছে। কপিল তার রশ্মিযন্ত্র দিয়ে লতা দুটোকে পুড়িয়ে উঠে পড়ে ভেলায়। শুভ্রাকে টেনে তুলে নেয়। তারপর উড়ে যায় শহরের দিকে!

শুভ্রা দু হাতে প্রাণপণে কিল দেয় কপিলের পিঠে। চিৎকার করে বলতে থাকে—আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আমার বাচ্চাদের কাছে যাবো! ছেড়ে দাও!

রাত্রে শুভ্রাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল কপিল। আজ রাতেও তার নিজের ঘুম এল না। জানালার ধারে সে বসে দেখল, আকাশী পথের এত উঁচুতেও বন্যজন্তুরা চলাফেরা করছে। তাদের জ্বলজ্বলে চোখ বার বার ঝিকিয়ে ওঠে কপিলের দিকে। ঘরে বাতাসের বিছানায় শুভ্রার শরীর ভেসে আছে। অঘোর ঘুম। ওরকম ঘুমোতে ইচ্ছে করে কপিলেরও। কিন্তু বড় ভয়, ঘুমোলেই কখন বাহির এসে দখল করে নেয় ভিতরকে। ঘর কখন হয়ে যায় মহারণ্য।

সকালে শহর পতনের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঢুলতে ঢুলতে চমকে ওঠে কপিল। সারাক্ষণ তার আধোচেতনায় শব্দটা তরঙ্গ তুলেছে।

একটা কাচতন্তুর পোশাক করে কপিল বেরিয়ে পড়ে ছোট্ট এক মোটর-কপটারে। উড়ে আসে পশ্চিমে। দূর থেকেই দেখতে পায়

অতিকায় বুলডোজারটা থেমে আছে। গোঙাচ্ছে তার পারমানবিক ইঞ্জিন, কিন্তু ঐ মহা শক্তিধর যন্ত্রটা এগোচ্ছে না।

কপিল দেখে, যতখানি জায়গার বাড়ি ঘর ভেঙে জমি চৌরস করেছে যন্ত্র, ততখানি জায়গা জুড়ে কয়েকদিনেই গজিয়ে উঠেছে দেড় মানুষ উঁচু সব গাছপালা। সৈনিকের মতো সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে আদিম অরণ্য।

কপিল নেমে এগিয়ে যায় যন্ত্রটার কাছে। মহাযন্ত্রের সামনে তাকে পিঁপড়ের মতো ছোটো লাগে। সে ঘুরে ঘুরে দেখে, ধাতব যে পাতের খাঁজে যন্ত্রের দাঁতাল চাকা ঘোরে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লতানে গাছ ঢেকে গেছে। নিষ্পেষিত হয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তবু লতাগুলো অবিরল প্রবেশ করেছে চাকার খাঁজে। পরতে পরতে জমে গেছে ভিতরে। উঁচু উঁচু গাছ থেকে মোটা লতার আঁকশি এসে ধরেছে যন্ত্রের উপরকার রাডার যন্ত্রকে। ছেয়ে ফেলেছে যন্ত্রের উপরিভাগ। ভিতরে ইঞ্জিন গজড়াচ্ছে, কাঁপছে যন্ত্রের শরীর, কিন্তু এগোতে পারছে না। তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে অরণ্যের মহাগর্ভ।

কোমর থেকে রশ্মি যন্ত্রটা খুলে হাতে নিল কপিল। বোতাম টিপতে যাবে, হঠাৎ সে সময়ে একটা পাথর উড়ে এল তার দিকে।

চমকে মাথা সরিয়ে নিল কপিল। পরমূহূর্তেই আর একটা পাথর এসে যন্ত্রের গায়ে খটাং করে লাগল।

কপিল বিস্ময়ভরে মুখ ফিরিয়ে দেখে, দেড় মানুষ সমান উঁচু আগাছার জঙ্গল ভেদ করে একটা নগ্ন মানুষের মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। তার দু হাতে ধরা হিংস্র পাথর।

কপিল চেঁচিয়ে ওঠে—জান।

নগ্ন জান, কোনো জবাব দেয় না। শুধু সরোষে আর একটা পাথর ছুঁড়ে মারে কপিলকে।

কপিল বসে পড়ে। পাথরটা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কপিল তীব্র স্বরে বলে ওঠে—জান। আমার হাতে রশ্মি যন্ত্র রয়েছে। তুমি কি করছ জান? বাধা দিও না, মরবে।

জান অকপট হিংস্রতায় চেঁচিয়ে উঠল—আ! হো-আ আ হো-আ।

অমনি সেই ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে অরণ্যের ভিতর থেকে। জঙ্গল ভেদ করে অনেক পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে কপিলের দিকে। কপিল দেখতে পায় জঙ্গল ভেদ করে আরো কয়েকজন নগ্ন মানুষ বেরিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে তার নিজের ছেলে এগারো বছর বয়সের কৌশিক।

একটা পাথর ছুটে এসে কপিলের মাথায় লাগে।

কপিল পড়ে যায়। মাথাটা চেপে ধরে সে ফের ওঠে। তারপর দৌড়ে গিয়ে তার মোটর-কপটারে উঠে পড়ে। কিন্তু অবিরল বৃষ্টি ধারার মতো পাথর এসে পড়তে থাকে যানটির গায়ে। ক্রুদ্ধ কপিল তার রশ্মি-যন্ত্রটা তোলে। বোতামে আঙুল।

কিন্তু বুকের মধ্যে এক মায়া তার আঙুলকে শিথিল করে দেয়। কি করে যে তার বন্ধু জানকে মারবে? কিংবা ছেলে কৌশিককে?

মোটর-কপটারটাকে তীব্র গতিতে ওপরে তুলে নেয় কপিল। তারপর ভাসতে ভাসতে ফিরে যায় শহরের দিকে।

একদিন মাঝরাতে কপিলের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে নিঃশব্দে খুলে যায়। একটা ছায়মূর্তি এসে দাঁড়ায় দরজায়। তার চুল দীর্ঘ, সম্পূর্ণ নগ্ন সে। হাতে ধারাল পাথর।

বাতাসের বিছানায় উঠে বসে শুভ্রা। চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

ছায়ামূর্তি চাপা স্বরে বলে—আ! হো-আ!

তীব্র হর্ষধ্বনি করে শুভ্রা চেঁচিয়ে ওঠে, কৌশিক! আমার ছেলে।

ছায়ামূর্তি বলে—আ! হো-আ!

শুভ্রা সম্মোহিতের মতো বাতাসের বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। স্বপ্নোত্থিতের মতো, ঘুমঘোরে এগিয়ে যেতে থাকে দরজার দিকে। সামনে প্রসারিত দুই হাত। ফিস ফিস করে বলে—ছেলে! আমার ছেলে!

কৌশিক বলে—আ! হো-আ!

শুভ্রা মাথা নাড়ে। সে বুঝেছে। এক পা এক পা করে সে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। তারপর একবার মুখ ফিরিয়ে চায়। কপিল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিষ্ঠুরতায় কঠিন তার মুখ। হাতে রশ্মিযন্ত্র।

শুভ্রা একটু বুঝি হাসে। তারপর আস্তে বলে ওঠে—আ! হো-আ!

অমনি বাইরে থেকে কয়েকটি কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে ওঠে—আ! হো-আ!

কপিল যন্ত্র নামিয়ে রাখে। শুভ্রা দরজা পার হয়ে চলে যায়। বাইরে হর্ষধ্বনি শোনা যায়।

কপিল আলো জ্বালবার সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। টেলিভিশনের বোতামে চাপ দিল। পর্দা অন্ধকার রইল। টেলিফোনে ডাক পাঠাল এদিক ওদিক। টেলিফোন নিস্তব্ধ রইল।

ভোর পর্যন্ত জানলার ধারে বসে থাকে ঘুমহীন কপিল। শহরের

আলো নিভে গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আর কাজ করছে না। টেলিভিশন বোবা। বেতারযন্ত্র অচল।

ভোরের প্রথম আলো এসে শহরে পড়লে কপিল দেখে, কী সুন্দর সবুজের ঢেউয়ে সবুজের বন্যায় ডুবে যাচ্ছে সব কিছু। বাড়ির মাথায় মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়ছে সবুজের নিশান। আকাশে অজস্র পাখি। মাটির বুকে বন্যজন্তুর পায়ের শব্দ; জয়ের চিৎকার, আর ভালবাসার ডাক। অরণ্যের গন্ধ আসছে। মর্মরধ্বনি আসছে।

পৃথিবীর সব যান্ত্রিক শব্দ কয়েক হাজার বছরের জন্য থেমে গেছে।

# ইশারা

এ সপ্তাহে আরো দু' হাজার লোক পাগল হয়ে যাবেন, বিভিন্ন কল কারখানা, অস্ত্রাগার, বিমান, সড়ক ও রেলপথে অন্তর্ঘাতের দেড়শ ঘটনা ঘটবে। জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান মানুষেরা প্রকাশ্যে অপমানিত হবেন, মানুষে মানুষে ঝগড়া, বিবাদ, খুনোখুনি দাঙ্গা ক্রমশ বাড়বে। অকারণ হত্যাকাণ্ড ঘটবে বহুল পরিমাণে। কেউই কোথাও নিরাপদ নয়। বড় বড় শহর শূন্য হতে থাকবে আরো। টিপসি সুলতান আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে, এ সপ্তাহ এবং আগামী সপ্তাহগুলিতে খুবই সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন, আপনার প্রাণ সম্পত্তি ও সম্মান আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনার আর কেউ নেই, আপনি একা।

লম্বাটে, রোগাটে এবং ফর্সা ধরণের লোকটার নাম গুণ, অফিস থেকে ফেরার পথে গুণ রোজকার মত অফিসবাড়ির ত্রিশতলার ছাদে উঠে নিজের বাতাস-গাড়িতে চড়ে বসেছিল। কাচের বুদ্বুদের একটি ঢাকনার মধ্যে চমৎকার গদীর আসন, দুজন বসতে পারে তাতে। আসনের নীচে সিলিণ্ডার এবং অন্যান্য যন্ত্র লাগানো। কয়েকটা বোতাম টিপে আর একটি হাতল ধরে চালাতে হয়। সিলিণ্ডার থেকে নিম্নমুখী প্রবল জ্বলন্ত গ্যাস নিষ্কাষিত হয়। তারই উল্টো চাপে বাতাস-গাড়ি শূন্যে ভেসে যায়। খুব জোরে নয়, ঘণ্টায় বড় জোর দুশো কিলোমিটার। বেশী দূর যাওয়াও যায় না। সিলিণ্ডারে যে পরিমাণ গ্যাস ভরা যায় তাতে যন্ত্রটা মোটামুটি তিন ঘণ্টা নিরাপদে উড়তে পারে। দুর্ঘটনার ভয় নেই। গ্যাস হঠাৎ ফুরোলেও চলন্ত বাতাসগাড়ি আছড়ে পড়বে না। গ্যাস ফুরোলেই একটা প্যারাসুট আপনা থেকে খুলে যায়। বাতাসগাড়ি ভাসতে ভাসতে নীচে নামে। মাটির খুব কাছাকাছি এলে প্যারাসুট কাজ

করে না, তখন একটা বোতাম টিপলে ভিন্ন একটা সিলিণ্ডারের মধ্যে দুটো মিশ্রণের মিলন ঘটে হিলিয়াম গ্যাস তৈরি হয়ে যায়। সেই গ্যাস বাতাসগাড়িকে মাধ্যাকর্ষণের আচমকা টান থেকে বাঁচিয়ে ধীরে প্রায় হাত ধরে নামিয়ে দেয়।

গুণ বাতাসগাড়িতে উঠে যন্ত্র চালাতে গিয়ে বুঝতে পারল সিলিণ্ডারে এক ফোঁটা গ্যাস নেই। নেমে দেখল, সিলিণ্ডারের বর্মের মত ইস্পাতের গায়ে একটা নিখুঁত ছাঁদা। এই ইস্পাত ফুটো করা সহজ নয়। কিন্তু আজকাল এত সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে আর তা এতই সহজলভ্য যে, যে-কেউ তা যখন তখন ব্যবহার করতে পারে!

তার বাতাসগাড়িটিকে বিকল করে কার কি লাভ তা গুণ জানে না। ইদানীং প্রায়ই এ ধরণের ঘটনা নানাজনের ঘটেছে। তার ঘটল এই প্রথম।

আকাশে অবশ্য অজস্র বাতাসগাড়ি উড়ছে। তাদের মধ্যে ভাড়ার গাড়িও আছে। ভাড়াটে গাড়িগুলোর তলদেশ গাঢ় লাল, সে-রকম কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেয়ে গুণ তার কব্জির ঘড়ির দ্বিতীয় বোতাম টিপে ধরে ঘড়িটা আকাশের দিকে তুলে নাড়তে লাগল। সাদা চোখে কিছু দেখা যায় না বটে কিন্তু ঘড়ি থেকে একটা বিদ্যুৎ-চৌম্বক ঢেউ গিয়ে লাল বাতাসগাড়ির একটা অ্যান্টেনাতে জানান দেয় যে, কেউ গাড়ি চাইছে।

কোন কাজ হল না। সবক'টা ভাড়াটে বাতাসগাড়ির নীচেই হলুদ আলো জ্বলছে, তার মানে সওয়ারী আছে। এই অফিস ছুটির সময় খালি গাড়ি পাওয়ার ভরসাও গুণের ছিল না।

গুণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাতাসগাড়ির কঠিন ইস্পাতের সিলিণ্ডারে রহস্যময় ছিদ্রের কথা ভাবতে ভাবতে আকাশে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আকাশ ভরে গেছে বাতাসগাড়িতে। অজস্র অফিসের ছাদ থেকে হাজার হাজার বাতাসগাড়ি ধীর গতিতে

আকাশে উঠে বোঁ বোঁ করে ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। তাদের লেজের জ্বলন্ত আগুন অবিকল হাউয়ের মত দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রবল শিসের মত শব্দ। হাজার হাজার বাতাসগাড়ির শিস কান ঝালাপালা করে দেয়।

গুণ কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের অফিসের কাছে প্রায় শ' তিনেক বাতাসগাড়ি রোজ জড়ো হয়। সেগুলোর মধ্যে এখন গুটি চারেক মাত্র পড়ে আছে, গুণেরটা নিয়ে। বাকী তিনটি গুণের ওপরওয়ালাদের। ওপরওয়ালাদের গাড়িতে লিফট পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না গুণ। তবে সে একটু দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো দেখল। ওপরওয়ালাদের বাতাসগাড়িগুলো অনেক বেশী দামী। সেগুলোতে চার পাঁচজনের বসবার আসন রয়েছে, ভিতরে টেলিভিশন লাগানো। সিলিণ্ডার অনেক বড়। কম করে হাজার কিলোমিটার যাওয়ার মত গ্যাস তাতে ভরা যায়। এ রকম একটা বড় বাতাস-গাড়ি কেনার ইচ্ছে তার বহুদিনের। কিন্তু হয়ে উঠছে না।

ভাবতে ভাবতে গুণ লিফ্‌টে একতলায় নেমে রাস্তায় পা দেয়। রাস্তায় সারি সারি মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। রোল্‌স রয়েস, ক্যাডিলাক, মারসিডিজ। পুরোনো আমলের যানবাহন। এখন কেউই পারত-পক্ষে মোটরগাড়িতে চড়ে না। সারি সারি গাড়ি সওয়ারীর জন্য রাস্তায় হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুণ রাস্তায় পা দিতে না দিতেই গাড়ির ড্রাইভাররা ডাকাডাকি শুরু করে. আসুন মহারাজ, আসুন। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব। অ্যাক্সিডেন্টের কোন ভয় নেই।

গুণ হাসল। সে থাকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে। মোটরে গেলে কম করেও মিনিট চল্লিশেক লাগবে। কিন্তু সময় বড় মূল্যবান। অবশ্য এ কথা ঠিক মোটরগাড়িতে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় কম। সড়কপথে আজকাল ভারী মালের গাড়ি আর কদাচিৎ কয়েকটি মোটর চলে। তাই শহরের বিশাল চওড়া রাস্তাগুলি প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকে।

অব্যবহারে রাস্তাগুলিতে শ্যাওলা পড়ছে। তাই ফাঁকা রাস্তায় দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। অন্যদিকে আকাশে কিন্তু দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাতাস-গাড়িগুলোর গতিপথের উচ্চতা নির্ধারিত না থাকায় প্রায়ই ধাক্কা লাগে। লোক মরে। তবু গতি ও সময়ের দিক থেকে বাতাসগাড়ির তুলনা হয় না।

গুণ একবার ওপরের দিকে তাকাল। শহরের সিকি মাইল পর্যন্ত অজস্র বাড়ির ছাদ উঠে গেছে, বহু উঁচু দিয়ে গেছে ফ্লাই-ওভার। তাছাড়া টাওয়ার, হেলিপ্যাড আর শূন্যে স্থাপিত বিশেষ ধরণের বিমানবন্দর। আছে রকেট স্টেশন। সুতরাং এই বিশ শো বিশ সালে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়ালে আকাশ দেখা খুবই দুঃসাধ্য। গুণ ফাঁকা রাস্তা পার হয়ে চলন্ত ফুটপাথে দাঁড়াল। কিছুদূর গিয়ে ভূগর্ভের ট্রেন ধরতে এসকালেটরে পাতালে নামবার আগে সে একটা স্টলের স্লট মেশিনে পয়সা ফেলে বিকেলের খবরের কাগজ কিনে নিল।

নামে কাগজ। আসলে সংবাদপত্র আজকাল ছাপা হয় পাতলা পলিথিনের ওপর। অসম্ভব সুন্দর ছাপা। হাজার রঙে রঙীন সব ছবি, কমিক্স, বিজ্ঞাপন। পড়া হয়ে গেলে সংবাদপত্রটি ফেলে দেওয়ার নিয়ম নেই। বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো সংবাদপত্র রাখার জন্য ট্রে থাকে। সেখানে জমা হওয়া সংবাদপত্র আবার ফেরৎ যায়। পলিথিনের ওপর থেকে সব ছাপা ছবি ও অক্ষর মুছে আবার পরের দিনের সংবাদপত্র ছাপা হয়।

এসকালেকটরে অজস্র মানুষের ভীড়। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়ানো। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই গুণ কাগজ পড়তে থাকে! এত সুন্দর ছাপা সংবাদপত্রে কিন্তু আনন্দের খবর অল্পই আছে! সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে মনোরোগ। শুধু যে পাগলামীর বাড়বাড়ন্ত তা নয়, মনোরোগের হাজার রকম প্রকারভেদ দেখা যাচ্ছে। কখনো তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ,

দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা, ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা, কুঁড়েমী, যৌন অতিচার, সন্দেহবাতিক ইত্যাদি থেকে মনোরোগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত শতাব্দী থেকে যথেচ্ছ বিবাহ ও রক্তের মিশ্রণের ফলে জীনমালা বিশৃঙ্খল হয়েছে। ঐ দোষ দূর করা শতাব্দীর কাজ।

আজ খবরের কাগজে দিয়েছে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশই মনোরোগী। এদের মধ্যে আবার পঁচিশ শতাংশ সুস্পষ্ট-ভাবেই উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত। উন্মাদের মধ্যে আবার নব্বই শতাংশই হিংস্র ও বদমেজাজী। মনোরোগীদের এক বড় অংশের মধ্যে চাপা জিঘাংসা রয়েছে। এরা খুব সামান্য কারণে বা বিনা কারণেও যে কোন পুরুষ নারী বা শিশুকে হত্যা করতে পারে।

রোজই সংবাদপত্রে নতুন নতুন মনোরোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। আজ জনা পনেরো বিশিষ্ট ও অ-বিশিষ্ট লোকের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টায় স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন।

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার নীচে ডানদিকের কোণে সপ্তাহে একবার টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণী বেরোয়। আশ্চর্য এই, ঘোরতর টেকনোলজির যুগেও এই ছদ্মনামের আড়াল থেকে একটি লোক নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করে যায়। টিপসি সুলতানের কোন টিপ্‌স ব্যর্থ হয় না। কোথায় ঝড় বা ভূমিকম্প হবে কিনা, মহাজাগতিক রশ্মি কোথায় কখন কতটা ক্ষতি করবে, কোন্ মানুষের শরীরের দুর্জ্ঞেয় অভ্যন্তরে কোন্ জটিল রোগ দেখা দিয়েছে তা বৈজ্ঞানিকরা হুবহু বলতে পারেন। কিন্তু টিপসি সুলতান আরো এক ধাপ এগিয়ে তার টিপ্‌স দেয়। বৈজ্ঞানিকদের চেয়েও তা অনেক বেশী অব্যর্থ। কয়েক সপ্তাহ আগে টিপসি বলেছিল, এক বিশেষ তারিখে চাঁদের উপনিবেশে প্রচণ্ড উল্কাপাতের ফলে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। তাই হয়েছিল। ওই বিশেষ দিনে চাঁদের বৈজ্ঞানিক উপনিবেশে উল্কাপাতের ফলে ফটো প্রসেসিং ল্যাবরেটারির প্রচণ্ড

ক্ষতি হয়, কয়েকজন মারা যায়, জনা কুড়ি কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাগলামীর লক্ষণ ডাক্তাররা খুঁজে পাওয়ার অনেক আগেই টিপসি তা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছিল।

আজকের কাগজে টিপসি যে টিপ্‌স দিয়েছে তাও বড় হতাশা-ব্যাঞ্জক।

গুণ ভূগর্ভ রেলের দুটি স্তর পেরিয়ে একেবারে নীচের তলায় নেমে এসে এসকালেটর ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। ওপরতলার দুটি স্তরে দূরপাল্লার পাতাল রেল চলে। অল্প পাল্লার ট্রেণ চলে সবচেয়ে গভীর পথে। ভীড় এই সব ট্রেণেই বেশী। এসকালেটর উগরে দিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ।

প্ল্যাটফর্মে ভীড়ের ভিতর থেকে কে যেন ডাকল—গুণ! মহিলার গলা।

গুণ খুব আস্তে ঘাড় ঘোরালো। দেখল কাচতন্তুর কৃত্রিম পশমের শাড়ি পরা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে। প্রকৃতি দেখতে খুব সুন্দর নয়। কিন্তু আজকাল নিজের চেহারাকে নতুন ছাঁচে ঢালার এমন ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে যে হরদম লোকের চেহারা বদলে যাচ্ছে। খুব চেনা লোককেও চেনার উপায় থাকে না। প্রকৃতি তার মুখখানাকে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর করেছে। ছোট চোখ চিরে বড় করিয়েছে, মোটা ঠোঁট পাতলা করেছে। তবে একেবারে আমূল পাল্টে ফেলেনি। এখনো চেনা যায়।

গুণ এক পা এগিয়ে বলল, কোথায়?

প্রকৃতি—টোকিও। কাল ফিরব।

গুণ বলে, এরোড্রামে যেতে বাতাসগাড়িই তো ভালো ছিল।

প্রকৃতি একটু মজার হাসি হেসে বলল, তোমারটা কই?

. সিলিণ্ডার ফুটো।

আমারও।

সে কী! গুণ চমকে জিজ্ঞেস করে।

প্রকৃতি তেমনি হেসেই বলে, উঠতে গিয়ে দেখি, গ্যাস নেই. সিলিণ্ডার ছাঁদা। স্কুলের কোন দুষ্টু বাচ্চার কাজ।

গুণ চিন্তিতভাবে বলে, দুষ্টু বাচ্চা? কৈ, আমার অফিসে তো দুষ্টু বাচ্চা নেই। তবে আমারটায় কী করে হল?

প্রকৃতি ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে! ঝিমি কেমন?

ভাল। তবে অনেক প্রেমিক তার, আমি বেশী পাই না।

আমার অত প্রেমিক ছিল না।

তা বটে। বলে গুণ প্রকৃতির দিকে নিস্পৃহ ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। প্রকৃতি ছিল তার তৃতীয় বিয়ের বউ। বছর চারেক আগে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন গুণের দশম বিয়ের বউ ঝিমির সঙ্গেও তেমন বনিবনা হচ্ছে না, বিচ্ছেদ আসন্ন। স্ত্রীদের প্রেমিক থাকবে, স্বামীদের প্রেমিকা—এ যুগে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঝিমির প্রেমিকের সংখ্যা এত বেশী যে তাকে গুণ সাতদিনেও একদিনের জন্য পায় কিনা সন্দেহ। ঝিমি এর আগে আরো সাতবার বিয়ে করেছে—সব স্বামীরই একই অভিযোগ। গুণ প্রকৃতিকে বলল, তোমার চতুর্থ বিয়ে হবে বলে শুনছিলাম। কী হল?

করছি না। ও পাট এবার তুলে দেবো। বিয়ে নয়।

বিয়েটা অবশ্য বাহুল্য মাত্র। আজকাল বিয়ে হয় হাতে গোনা সংখ্যায়। বিয়ে ছাড়াই মেয়ে পুরুষে একসঙ্গে থাকাটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল। গুণ বলল, আমিও তাই ভাবছি।

ঝিমিকে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয়ই।

তুমি?

আমি জেফরের কাছে থাকছি।

জেফরে? যে বিশাল চেহারার কানাডিয়ান ছেলেটা স্থির বিমান কোম্পানির ইনজিনীয়ার?

প্রকৃতি ঠোঁট উল্টে বলে, চেহারাই বিশাল। আসলে কোন উত্তেজনাই নেই। ভেড়া।

গুণ চুপ করে থাকে। মেয়েরা ছেলেদের কাছে প্রচুর শারীরিক উত্তেজনা আশা করে। কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব। সর্বশেষ আদম সুমারিতে দেখা গেছে, পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা আড়াইগুণ বেশী। এই অসম হারের দরুণ একজন পুরুষকে গড়ে আড়াইটি মেয়েকে খুশি করার ভার নিতে হয়! এটা অংকের হিসেব। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আরো জটিল। মানুষের মধ্যে আজকাল একটা বিশাল শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, যাদের নিস্পৃহ নামে অভিহিত করা হয়। এরা হল অতিরিক্ত যৌন মিলনের শিকার। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে এরা সম্পূর্ণ অক্ষম। নির্বীর্য তো বটেই, উপরন্তু মেয়েছেলের নাম শুনলে পর্যন্ত ভয় পায়। এই সব পুরুষেরা অধিকাংশই সমাজ সংসার থেকে বহুদূর কোন নির্জন দ্বীপে বা জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে এরা পুরুষ গণ্য হলেও কার্যত পুরুষ নয়। ফলে সক্ষম পুরুষের সংখ্যা বড়ই কম। সক্ষমদের প্রতিদিন এত বেশী সংখ্যক মহিলার সন্তুষ্টিবিধান করতে হয় যে তাদের আর কোনরকম মহিলাপ্রীতি থাকে না। বেচারা জেফরেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

গুণ একটু হেসে বলল, টোকিওয় কোথায় যাচ্ছ? মা বাবার কাছে?

মা মারা গেছেন পরশু।

ও।

সুইসাইড।

গুণ ভ্রূ তুলে বলে, হঠাৎ? কি হয়েছিল?

প্রকৃতি ভ্রূ কুঁচকে কি একটা ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে, বলল, পুরোন আমলের লোক, ওদের মনে নানারকম সংস্কার। কিছু একটা মনের ব্যাপার হয়েছিল। বাবা টেলিফোনে বলল, তোমার মা সুইসাইড করেছে। ব্যস, ঐটুকুই জানি।

তোমার যাওয়ার দরকার কি? ডেডবডি তো এতক্ষণে ফারটিলাইজারের কারখানায় পাচার। বোধহয় তা দিয়ে মণ্ড তৈরিও হয়ে গেছে।

প্রকৃতি হেসে বলল, ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়, মা মারা যাওয়ায় বাবা খুব একা, ওরা একটা ছোট্ট দ্বীপে একদম একা একা থাকত। মা মারা যাওয়ায় বাবা আরও একা। বোধহয় সহ্য করতে পারছে না।

আবার বিয়ে দাও।

প্রকৃতি হেসে বলে, দেখি। কিন্তু বাবা তো খুব অথর্ব। হাঁটাচলাও করতে পারে না ভাল করে। যাচ্ছি, দেখি কি করা যায়।

প্রায় নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতি ট্রেনটি এলো। এই ট্রেণের চাকা নেই, এয়ার কুশনের ওপর দিয়ে চলে।

প্রকৃতি আর গুণ প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে একটা কামরায় উঠে দাঁড়াল। আশে পাশে সব মানুষই অন্যমনস্ক, নিস্পৃহ। প্রায় কেউই কারও দিকে তাকায় না। গায়ে ধাক্কা লাগলে বা পায়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে কেউ কারও কাছে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করে না। গায়ে পড়ে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মানুষকে আজকাল বোবায় ধরেছে।

গুণের হাতের কাগজটা দেখে প্রকৃতি হেসে জিজ্ঞেস করে, টিপসি কি বলছে?

খারাপ।

প্রকৃতি মাথা নেড়ে বলে, প্রায়ই তাই বলছে। এবার কতটা খারাপ?

খুব।

টিপসি সব সময় খারাপ দেখে, আমি দেখি না।

খারাপ নয়?

প্রকৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। বেশ তো আছি।

পাগলামি বাড়ছে।

তাতে আমার কি ?

মানুষের ভাবনা চিন্তা আজকাল সোজা পথে চলে। যতক্ষণ আমি ভাল আছি ততক্ষণ দুনিয়া রসাতলে গেলেই বা আমার কি ?

কি কারণে কে জানে, গুণ এখন ও রকম ভাবতে পারে না। সে এখন আর পাঁচজনকে নিয়ে ভাবে। গুণ বলল, খুন হবে।

হোক। যা ভীড় চারদিকে ! লোক কমলে বাঁচি।

যদি তুমিই খুন হও ?

যতক্ষণ তা না হচ্ছি ততক্ষণ তো সব ঠিক আছে। প্রকৃতি খুব নিস্পৃহ গলায় কথাটা বলে।

গুণ চুপ করে থাকে।

গুণের পিছনেই একজন নগ্ন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর ভীড়ের চাপে গুণের শরীরের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। হয়তো এই গা ঘষাঘষির মধ্যে মেয়েটির নিজেরও কিছু অভিসন্ধি থাকতে পারে। গুণ একবার পিছন ফিরে মেয়েটিকে নিষ্কাম চোখে দেখল। ভারী সুন্দর চেহারার মেয়েটি মৃদু হাসে।

গুণ হাসিটা ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে একটু সরে দাঁড়ায়। বহুদিন হয় তার কামেচ্ছায় ভাঁটা পড়েছে। এ মেয়েটি তাকে শরীরের আমন্ত্রণ জানাতে চাইলেও সে তা রক্ষা করতে পারবে না।

প্রকৃতিও মেয়েটিকে দেখল। ভাবলেশহীন মুখে গুণের দিকে একবার চেয়ে বলল, আমি এবার নামছি।

গুণ মাথা নাড়ল। ট্রেণ থামল এবং প্রকৃতি নেমে গেল অজস্র লোকের সঙ্গে।

বসার জায়গা পেয়ে গুণ বসল। সেই নগ্ন মেয়েটি তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, বসার জায়গা পায়নি। দাঁড়িয়ে হাসছে। গুণ শিউরে চোখ বন্ধ করে থাকে।

নগ্ন মেয়েটি তার অনিচ্ছা লক্ষ্য করেই বোধহয় ধীরে ধীরে এক প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

গুণ সংবাদপত্রটি বের করে আবার পড়তে থাকে। টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণীই আবার পড়তে থাকে সে। ভ্রু কুঁচকে যায়। চিন্তার রেখা পড়ে মুখে।

টিপসি কি ছদ্মনামের আড়ালে কোন মানুষ? না কি অত্যাধুনিক কোন কমপিউটার? টিপসির এসব টিপ্‌স কি ইনটুইশন না ক্যালকুলেশন? এ নিয়ে আরও লক্ষ লোকের মত গুণও ভাবে। আজ পর্যন্ত টিপসির প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র হদিশও কেউ পায়নি। কিন্তু টিপসির টিপ্‌সগুলো বড় চমকপ্রদ।

গুণ চোখ তুলে কামরার ছাদের কাছে কাচের প্যানেলের গায়ে তাকাল। একের পর এক স্টেশনের নাম ফুটে উঠছে। ট্রেণ স্টেশনে থেমেই আবার দৌড়চ্ছে।

গুণ উঠল, পরের স্টপই তার।

দরজার কাছ-বরাবর সে দেখতে পেল সেই নগ্ন মেয়েটি আর প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মেয়েটি রাগে ফুঁসছে। প্রৌঢ় কিন্তু শক্ত চেহারার লোকটি কঠিন গলায় বলল, না।

মেয়েটি সপাটে একটা চড় কষাল লোকটার গালে। লোকটাও মেয়েটির ডান হাত মুচড়ে ধরল ভয়ঙ্কর ভাবে।

রাস্তায় ঘাটে এ রকম হামেশাই ঘটে। কেউ গা করে না. তাকিয়েও দেখে না।

গুণের একটু খারাপ লাগল। প্রৌঢ়ের মুখটা তার চেনা-চেনা। একটু এগিয়ে সে তুজনের মাঝখানে পড়ে। মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, পুতুল-সঙ্গীর তো অভাব নেই।

মেয়েটি তেমনি ফুঁসছে। প্রৌঢ় তার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। মেয়েটি গুণের দিকে চেয়ে বলে, পুতুল-সঙ্গী চাই না। রক্তমাংস চাই। দেবে?

গুণ ম্লান হাসে। মেয়েদের সন্তুষ্ট করার জন্য কৃত্রিম পুতুল-সঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন। প্রথম প্রথম মেয়েরা তাতেই খুশি ছিল। ঠিক মানুষের আকার প্রকারে তৈরি এবং সব রকম যৌনমিলনের প্রক্রিয়ায় দক্ষ এই সব কলের মানুষে মেয়েরা আর তৃপ্ত হচ্ছে না। তারা মানুষ চাইছে।

গুণ মাথা নেড়ে বলে, উপায় নেই।

তোমাদের সকলেরই এক কথা। কেন? মেয়েটা প্রবল রাগ মেশানো অভিমানের গলায় বলে।

ট্রেন থামতেই গুণ নেমে পড়ে। মেয়েটাও। প্রৌঢ় নামে না।

স্টেশনে নেমে হঠাৎ গুণের মনে পড়ল, ঐ প্রৌঢ় তার বাবার ছোট ভাই। এক সময়ে বাবার ছোট ভাইকে কাকা বলার নিয়ম ছিল। এখনো কেউ হয়তো ডাকে। গুণ নিজে অবশ্য কখনো কাকা-জ্যাঠা বলে কাউকে ডাকেনি। আগের দিনের মত আত্মীয়তার সম্পর্ক তো আর এখন মানা হয় না। প্রকৃতি যেমন মা বাবার উল্লেখ করল, বাবার কাছে গেল, তেমনটাও আজকাল কদাচিৎ হয়। বাবা মার প্রতি অতখানি কর্তব্য করার কোন মানেই আজকাল নেই। গুণ নিজের বাবাকে দেখে না প্রায় পনেরো বছর, সে লোকটা এ শহরেই থাকে। তার মা বহুকাল আগে বাবাকে ছেড়ে গেছে। মাকেও বহুকাল দেখেনি গুণ। হয়তো মা এদেশে নেই, হয়তো মরে গেছে।

গুণ অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমটায় টের পায়নি যে, নগ্ন মেয়েটি তার প্রায় গা ঘেঁসে হাঁটছে। মেয়েটির কনুইয়ের ঠেলা খেয়ে সচেতন হয়ে গুণ তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল। বছর কুড়ির বেশি বয়স হবে না। ভারী সতেজ, সুন্দর দীঘল চেহারা। মুখশ্রী অসাধারণ সুন্দর। মেয়েটি অর্থপূর্ণ একটু হাসে।

গুণ মাথা নেড়ে বলে, না।

কামবোধ বলতে আজকাল গুণের কিছু নেই। আরও বহুকাল

বোধটা জাগবেও না। কিন্তু এই কামকাতরা মেয়েটির জন্যে তার একটু কষ্ট হচ্ছিল। সব মেয়ের জন্যে হয় না, কিন্তু এ মেয়েটির মুখে কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে।

মেয়েটি হাল ছাড়েনি। গুণের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমরা সবাই ফিরিয়ে দিচ্ছ, আমি কোথায় যাব?

গুণ বলতে পারত, পুতুল-পুরুষের কাছে যাও। কিন্তু তা বলল না। গুণের এখুনি বিশেষ কোথাও যাওয়ার নেই। ঝিমি পরশু তার চারজন প্রেমিককে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের এক মাইল গভীরে জলের নীচের শহর রিদ্‌ম-এ বেড়াতে গেছে। সমুদ্রের নীচে এখন হাজারটা শহর, তার মধ্যে রিদম সবচেয়ে কুখ্যাত। শুধু প্রমোদ আর যথেচ্ছাচার ছাড়া সেখানে আর কোন কর্ম নেই।

তিতিরের কাছেও গুণ কয়েকদিন যাবে না। তিতিরের পেটে ক্যানসার হয়েছে, সে আছে হাসপাতালে। সেরে উঠে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে তার এখনো দিন দশেক লাগবে। মৈত্রী এখনো ফেরেনি দক্ষিণ মেরুর ভূগর্ভ শহর থেকে।

সুতরাং গুণ এখন সঙ্গীছুট। পুরুষ বন্ধু বলতে গুণের প্রায় কেউই নেই। বন্ধু কেউ কারো হয়ও না আজকাল। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস আর সন্দেহ করে। খানিকটা বন্ধু হয় বরং মেয়ে পুরুষে। তাও বেশী দিনের জন্যে নয়। ভাল না লাগার ঢেউ এসে সম্পর্ক ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

স্টেশনের চত্বরটা বিশাল। মাটির নীচে দিনের মত উজ্জ্বল আলো। স্টেশনের চত্বরেই হরেক জিনিসের দোকান, লাইব্রেরী, ছোট ছোট ব্যাটারিচালিত বগি গাড়ি এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্টেশনের চত্বরের যে কোন জায়গায় যেতে হলে ইচ্ছেমত এইসব বগি ব্যবহার করা যায়।

গুণ একটা বগি গাড়িতে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটিও বিনা প্রশ্নে উঠে তার পাশে বসে। সম্ভবত মেয়েটি বুঝতে পেরেছে, গুণ খুব নরম মনের মানুষ।

গুণ বগিটা ছেড়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, কোথায় ?

তোমার সঙ্গে।

কেন ?

আমি একা।

গুণ মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বগিটা যদৃচ্ছা যেতে দিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, একা কে নয় ?

মেয়েটি তার একরাশ কালো চুল আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তুমিও একা ?

গুণ মাথা নাড়ে।

মেয়েটি বলে, আমি সুসি। তুমি ?

গুণ।

থাকবে আমার সঙ্গে ?

না।

কেউ চাইছে না। কেন ? আমি কি খারাপ ?

তা নয়।

খুব বেশী চাইব বলে ভয় পাচ্ছ ?

পাচ্ছি। বলে গুণ বড় শ্বাস ফেলল।

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। চোখ হল সুদূর। আস্তে করে বলল, আমি একটু বেশী চাই। ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে চাইব না। শুধু থাকব।

একাই তো ভাল।

আমার ভয় করে।

গুণ একটু চমকে চাইল মেয়েটির দিকে। কচুরিপানা সরালে যেমন স্বচ্ছ জল, তেমনি মেয়েটির মুখ থেকে উগ্র কামের ভাবটি সরে যাওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটির মুখে একটা কোমল লাবণ্য। সেই লাবণ্যের মধ্যে একটু ভয়ের শুষ্কতাও বুঝি আছে।

গুণ বলে, ভয় কেন ?

মেয়েটি বলল, কি জানি! খুব ভয়।

বয়স?

কুড়ি। দু' হাজার সালে আমার জন্ম। আমি বড় হয়েছি দোলনায়।

যে সব বাচ্চাকে জন্মের পরই মা বাবা ত্যাগ করতে চায় তাদের লালন পালন করার জন্যে সরকারের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার নাম দোলনা।

ও। গুণ মুখটা ফিরিয়ে নেয়। তারপর বলে, হাজার হাজার লোক দোলনায় বড় হয়েছে।

সে সত্যি! কিন্তু আমার সমস্যা অন্য। আমাকে সবাই এড়িয়ে চলে, ভয় পায়।

গুণ গম্ভীর হয়ে বলে, এখন কি চাও?

চাই! বলে মেয়েটি যেন ভাবতে থাকে।

গুণ বগি গাড়িটা চালিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। রেস্তোরাঁর হলটি বিশাল। অজস্র লোক বসে খাচ্ছে। বহু মানুষ খাবারের প্যাকেট কিনছে। আজকাল কেউ রান্নাবান্না করে না।

গুণ বগি থেকে নামে। সঙ্গে সেই মেয়েটি।

নিরিবিলি একটা টেবিলে গিয়ে তারা বসে। টেবিলের কাচের ওপর একটা ইলেকট্রনিক খাদ্যতালিকা পড়ে আছে। খাবারের নামের পাশে পাশে ছোট ছোট বোতাম। গুণ তিন চারটে বোতামে চাপ দিল। মেয়েটি চাপ দিল একটি বোতামে।

খানিকক্ষণ বাদে পরোক্ষ-চালিত একটা ট্রলি নিজে থেকেই গড়িয়ে এলো টেবিলের পাশে। তার ওপর তাদের পছন্দমত খাবার সাজানো।

গুণ তার খাবারের প্লেট তুলে নিতে নিতে দেখল, মেয়েটি শুধু এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় চেয়েছে। এই বিশেষ পানীয়টিতে ওষুধ মেশানো থাকে। খেলে কিছুক্ষণের জন্যে কোন শারীরিক অনুভূতি থাকে না আর খুব আনন্দ হয়।

তবে নেশা নয়।

গুণ বিরক্ত হচ্ছিল আবার করুণাও বোধ করছিল। খেতে খেতে সে বললে, এখান থেকেই কিন্তু আমরা যে যার পথে যাব।

আমার পথ নেই। গন্তব্য নেই।

সে আমি জানি না।

তোমার কে আছে?

গুণ ভ্রু কুঁচকে বলে, কয়েকদিন আমি একা। ভাল আছি।

মেয়েটি ঢক ঢক করে অনেকখানি পানীয় গিলে ফেলে। তারপর বোবা মুখে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

রেস্তোরাঁয় আরো বহু নগ্ন ও পোশাক পরা মেয়ে পুরুষ রয়েছে। বেশীর ভাগই সঙ্গীহীন। কথাবার্তার প্রায় কোন শব্দই নেই। হাসির আওয়াজ শোনা যায় না। আর একটা জিনিসও আজকাল দুর্লভ দর্শন—সেটা হচ্ছে শিশু। আজকাল শিশুরা প্রায় বর্জিত। মা বাপ তাদের দায়িত্ব নেয় না। তারা বড় হয় দোলনায়।

গুণ চোখ তুলে দেখল মেয়েটি বিহ্বল চোখে একদৃষ্টে তাকেই দেখছে। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানীয়র ফেনা গড়িয়ে নেমে আসছে থুতনী বেয়ে।

মেয়েটি নতমুখে বোধহয় নিজের শরীরের দিকেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মুখ তুলতেই গুণের মনে হল, এ মেয়েটির চোখে একটা অদ্ভুত চকিত আলো খেলে যাচ্ছে। পাগল?

গুণ আস্তে করে বলে, আর কি চাও?

তোমাকে।

এমন ভাবে বলল যে গুণ একটু চমকে যায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমিও আর পাঁচজন পুরুষের মত! কোন উত্তেজনা নেই।

তবু। আমি একা থাকব না।

আমার একা থাকাই দরকার।

আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। শুধু থাকব।

তোমার ডেরা কোথায় ?

কোথাও কিছু নেই। আমি এর ওর কাছে থা'ক।

কেন ? ডেরার তো অভাব নেই।

ডেরা থাকলেই তো একা।

ও। গুণ বিরক্ত হয় আবার।

তুমি কেন রেগে আছ ? আমি তো কিছু চাইনি।

কিন্তু···।

আমি নিজেকে ওযুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব।

ঘুমোলে আর সঙ্গীর দরকার কি ?

ঘুমের মধ্যেও আমি ভয় পাই যে। মনে হয়, কেউ খুন করবে।

আমার কাছে সে ভয় নেই ?

হয়তো আছে।

আছেই তো। আমিও হয়তো খুন করতে পারি।

পারো ?

নয় কেন ?

মেয়েটি হেসে বলে, তবে অনুরোধ, ঘুমোলে মেরো না। জেগে থাকতে থাকতে মেরো।

গুণ অবাক হয়ে বলে, কেন ?

ঘুম বড় ভাল জিনিস, তখন মারলে আমি কষ্ট পাব।

তাছাড়া এমনিতে মারলে কষ্ট পাবে না ?

মেয়েটির মুখে মৃদু একটু রহস্যের হাসি। বলল, পাব। তবে আমার কাছে ঘুম বড় দুর্লভ জিনিস। কোন দিনই ঘুমের ওষুধ না খেলে আমার ঘুম আসে না, ঘুম আসে না কেন জানো ?

কেন ?

ঐ ভয়েই। সব সময়ে মনে হয় আমি ঘুমোলে কেউ এসে আমাকে খুন করবে। ঘুমের মধ্যে খুন হতেই আমার যত ভয়।

গুণ এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। হাজারটা মানসিক রোগে মানুষ আজকাল ভুগছে। কেউ পুরো পাগল, কেউ বা অস্বাভাবিক। টিপসি ঠিকই লিখেছে। তাই সে বলল, আমি খুনী নই। তবে ভাল লোকও নই।

আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমাকে ক'দিন একজন সঙ্গী দাও।

আমি সঙ্গী হিসেবেও ভাল নই। গুছিয়ে কথা বলতে জানি না, প্রশংসা করতে জানি না, এমন কি আমি কর্কশভাষীও। খুব রেগে যাই অল্পে।

মেয়েটি পানীয় শেষ করার পর যথেষ্ট উজ্জ্বল ও লাল হয়ে উঠেছে। খুব গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তুমি খুব নরম মনের মানুষ।

এ কথাটা আজকাল নিন্দার সমগোত্রীয়। নরম মনের মানুষকে এ সমাজে কেউ পছন্দ করে না, বরং সন্দেহের চোখে দেখে। নরম লোকেরা সহজে আত্মীয়তা ভুলতে পারে না, ভাবাবেগের দরুণ তারা দখলীসত্ব রাখার চেষ্টা করে। তারা বাবা মা হিসেবে দাবি ফলায়, প্রেম-ট্রেম জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তারা পরিচিত কারো মৃত্যু হলে দুঃখ পায়।

কিন্তু গুণ জানে, মেয়েটা মিথ্যে বলেনি। বাস্তবিক সে কিন্তু নরম মনের মানুষ। সে মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে মুখভাব যথেষ্ট কঠিন করে রূঢ় গলায় বলে, আমি যাই হই তোমার সঙ্গে আমার খাপ খাবে না। আমার সব সময়ে সঙ্গী ভাল লাগে না।

দয়া কর।

না।

আমি দরকার হলে চুপ করে থাকতে জানি। তুমি টেরও পাবে না আমি আছি।

টের পাবই।

আমি খুব ভাল ভাল কথা বলতে জানি।

কথা শুনতে আমার আর ইচ্ছে নেই।

মেয়েটি একটু ঝুঁকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে সব সময়ে কে একজন যেন লক্ষ্য করে, একা হলেই টের পাই।

বিরক্ত হয়ে গুণ বলে, সুসি, এটা লক্ষ্য করার যুগ নয়। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় গোয়েন্দাগিরি দরকারি ব্যাপার ছিল। এখন তা নেই।

কিন্তু এটা গোয়েন্দার ব্যাপার নয়।

তবে ?

আমার একটা টের পাওয়ার ক্ষমতা আছে।

বাজে কথা। গুণ খাবার শেষ করে টেবিল থেকে ভেজা তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছল। বলল, আর যদি লক্ষ্য করেই তবে তো তুমি ভাগ্যবতী। বুঝতে হবে কেউ তোমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ লক্ষ্যটা সে রকম নয়। ঘৃণার।

গুণ উদাস হয়ে বলে, মনে হওয়া আর মনে হওয়া। মানুষের অকারণে যত কিছু মনে হয়! তুমি কোন কাজ কর না ?

আমি মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিলাম। সৌরলোকের সব গ্রহে আমি বার বার গেছি। ঠিক পনেরো দিন আগে আমাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

এখন ?

কিছু না। গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর মত আনন্দ আর কোন্ কাজে পাব ?

গুণ নিজে সব গ্রহে যায়নি। একবার সরকারি কাজে তাকে মঙ্গল গ্রহে যেতে হয়েছিল। চাঁদে সে কয়েকবার গেছে। মেয়েটি সব গ্রহে গেছে জেনে তার মনটা কি একটু নরম হল ?

গুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকের রাতটা তুমি আমার কাছে থাকতে পারো। কিন্তু বেশী বকবক করবে না।

কৃতজ্ঞতায় মেয়েটি উদ্ভাসিত হয়ে বলল, না। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি এখনও কুমারী।

গুণ ভ্রু কুঁচকে বলে, মিথ্যে কথা।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, সত্যি।

কোন পুরুষ তোমাকে নেয়নি?

না।

কেন?

আগে বল তোমার বয়স কত?

আমি চল্লিশ।

আমি মোটে উনিশ। তার অর্থ তোমার আর আমার মধ্যে একটা প্রজন্মের তফাৎ।

সেটা ঠিক।

তুমি বুঝবে না, আমাদের প্রজন্মে সক্ষম ও আগ্রহী পুরুষ কেউ নেই।

গুণ এ রকম কথা শুনেছে। কানাঘুঁষোয় জেনেছে অত্যাধুনিক যুবকরা দেহমিলন সম্পর্কে প্রচণ্ড অনাগ্রহী।

কৌতূহলে গুণ জিজ্ঞেস করে, যুবকেরা খুব ঠাণ্ডা বলছ?

খুব।

কেন?

কেন তা জানি না। তারা আগ্রহী নয় এটা দেখেছি।

তাহলে?

মেয়েটি হেসে বলে, তারা ফিরিয়ে দেয় বলেই আমি তোমাদের মত বয়স্কদের কাছে গেছি। তারাও ফিরিয়ে দেয়। আমি কুমারী রয়ে গেছি।

গুণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হয়তো মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে বারো তেরো বছর বয়স থেকেই আর কোন মেয়ে কুমারী থাকত না। মেয়েদের কৌমার্য

ছিল দুর্লভতম জিনিস। খুব বেশি দিনের কথাও তা নয়। এত অল্প দিনেই সে অবস্থাটা উল্টে গেল কি?

গুণের উদাসীন ভাবটা আর রইল না। পৃথিবীতে এখন কুমারী মেয়ে আছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে এই সত্য জানতে পেরে তার একধরণের জটিল আনন্দ হল।

মেয়েটির দিকে এবার অকপট আগ্রহ নিয়ে তাকায় গুণ। একটু হাসে আপন মনে। তারপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর সময়ে ইচ্ছে করেই মেয়েটির একটা হাত নিজের হাতে ধরে।

কলকাতার আট নম্বর উপনগরীর উপরিভাগে উঠে আসে তারা। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সূর্যের মতই আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সূর্যের মত অবিকল নয় এবং তাপও নেই। তবু চারদিকে একটা সুস্পষ্ট আলো সব সময়ে পাওয়া যায়। তাছাড়া রাস্তার আলো আছে। দোকানপাট থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। অফুরন্ত আলো, পারমাণবিক তাপ-বিদ্যুৎ থেকে অঢেল শক্তির উৎস পাওয়া গেছে।

চলন্ত ফুটপাথ ধরে খানিক এগিয়ে তারা ফের সিঁড়ি বেয়ে মনোরেলের একটা স্টপে উঠে দাঁড়াল। অবিরল মনোরেল চলছে। খুব ভীড় নেই।

দুজনে উঠে। চুপচাপ। মেয়েটা গুণের সঙ্গে কথা বলতে বোধহয় ভয় পাচ্ছে।

গুণের বাড়ি পৌঁছোতে বেশী সময় লাগল না। উপনগরীর একপ্রান্তে চমৎকার একটা কাচতন্তুর বাড়ি। এখনকার সমাজে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। এ বাড়িও গুণের নয়। সরকারী কোয়ার্টার মাত্র। তবে বাড়িটি চমৎকার। বৈঠকখানার দুটো দেয়াল স্বচ্ছ পলিথিনের তৈরি। বাইরের সবটুকু দেখা যায়।

শোওয়ার ঘরেও তাই।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চারদিকে দেখল। খুশি হল কিনা বোঝা গেল

না। তবে সুসির মুখে একটা অসম্ভব স্বস্তি ফুটে উঠল। গভীর শ্বাস ফেলল সে। মুখখানা শিশুর মত হয়ে গেল।

গুণ শান্ত স্বরে বলল, কী করবে এখন ?

আমি ঘুমোব।

ঘুমোও।

মেয়েটি হঠাৎ গুণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ঘুমের মধ্যে আমাকে মারবে না তো।

গুণ হাসল একটু। মাথা নেড়ে বলল, বলেছি তো আমি খুনী নই।

সুসি অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গুণের দিকে। তার চোখে ঘৃণা নেই, ভালবাসা নেই, কাম নেই, কৌতূহল নেই, সন্দেহ নেই, ভয় নেই। তবে একটু বুঝি তৃপ্তি আছে।

গুণ বলল, ঘুমের ওষুধ বিছানার ধারেই আছে।

আচ্ছা।

মেয়েটি ওষুধ খেল, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

গুণ বেরিয়ে আসে বাইরে। সে এখন বাড়িতে বসে থাকবে না। বেরিয়েই সে দাঁড়াল, ভাবল একটু। এ পাড়ায় গতকালও দুটো খুন হয়েছে। প্রায়ই হয়।

চমৎকার আলোয় পরিচ্ছন্ন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চায় গুণ।

এ পাড়া নির্জন।

বার বার বিদ্যুচ্চমকের মত গুণের মনে পড়ছে তার বাতাসগাড়ির গ্যাস সিলিণ্ডারে নিখুঁত একটা ছ্যাঁদার ঘটনাটি। কোন আধুনিক ড্রিল ব্যবহার করা হয়েছে ছিদ্র করতে। অত শক্ত ইস্পাতের বর্ম ভেদ করা বড় সহজ নয়।

আবার সে ভাবছে টিপসি সুলতানের টিপ্‌সের কথা। এ লোকটা কথনো বুজরুকী করেনি। টিপসি সুলতান কমপিউটার হোক বা

মানুষই হোক—এ পর্যন্ত সবই নির্ভুল টিপ্‌স দিয়েছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুণের তেমন কোন মোহ ছিল না। যা হওয়ার হবে, গুণের তাতে কী? সে তার জীবনটা কোনক্রমে কাটিয়ে গেলেই হল। কিন্তু আজকাল সে আর অতটা নিস্পৃহ নেই। পৃথিবী সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। সুসি তাকে বলেছিল, সে নাকি নরম মনের মানুষ। শুনে প্রথমে তার রাগ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটা মিথ্যেও তো নয়। পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কেউ মাথা ঘামায় না তখন তার কি দায় ঠেকল?

প্রকৃতির মা এক নির্জন দ্বীপে আত্মহত্যা করেছে; এই ছোট্ট, প্রায় তাৎপর্যহীন ঘটনাটা অনেকক্ষণ ধরে তার মনের আনাচে কানাচে মারবেলের মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি তার মার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু গুণ কেন যে ভুলতে পারছে না, কেবলই মনে হচ্ছে একটা কী ঘটতে চলেছে। যা ঘটবে তা ভাল নয়। ভাল নয়।

গুণ ফিরে এসে তার বাসার সামনে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে, তার বাড়িটা খুব নিরাপদ নয়। একা ঐ কুমারী মেয়েটি—কোন বিপদ ঘটতে পারে তার অনুপস্থিতিতে। একটু ভ্রূ কুঁচকে সে ভাবল। মনটা বড্ড নরম হয়ে এসেছে তার। লক্ষণটা ভাল নয়।

গুণ জোর করে মন থেকে অকাজের ভাবনা তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে হেঁটে গিয়ে টিউব রেলের স্টেশনে নামার সিঁড়িতে পা দেয়।

খানিক দূর নেমে সে এসকালেটর ছেড়ে একটা চাতালে দাঁড়ায়। এখানে টেলিফোন বুথ।

গুণ টেলিফোন তুলে নম্বরের বোতামে হালকা আঙুলে চাপ দেয়।

একটু বাদেই ওপাশে একটা যান্ত্রিক গলা বলে ওঠে—সেকটর আট···অনুসন্ধান···বলুন. আপনার কথা রেকর্ডে উঠছে।

গুণ আস্তে করে বলে, আমি আট নম্বর সেকটরের গুণ। কিউ

আটাত্তরে আমার বাসা। আমার বাতাসগাড়ির নম্বর সি এ টি দু-হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ।

তারপর ?

আমার গ্যাস সিলিণ্ডারে আজ কে ছিদ্র করেছে।

রেকর্ড হচ্ছে। বলুন।

গুণ মৃদুস্বরে বলে, আমার অফিস সেক্টর এফ-এ। সরকারী অফিস। আমাদের কাজ পুরোনো সব নথিপত্র পরীক্ষা করা। আমি কাজ করি ইনফ্রা-রেড রে বিভাগে।

অপেক্ষা করুন। যন্ত্র জবাব দেয়।

একটু চুপচাপ। তারপর যন্ত্রের গলা বলে, হ্যাঁ, আপনি কে তা আমরা বুঝতে পারছি। আপনার বাতাসগাড়ির রেকর্ডও পাচ্ছি।

আমি জানতে চাই, কে এই কাজ করেছে ?

যন্ত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলে, আর এক ঘণ্টা বাদে আমরা অপনাকে খবর দেব। আমাদের স্ক্যানার মেশিন আপনার বাতাসগাড়ি এবং আকাশের জায়গা পরীক্ষা করে সব তথ্য আপনাকে জানাবে।

আর একটা কথা—

বলুন।

আমার সঙ্গে আজ একটি মেয়ের আলাপ হয়েছে। নাম সুসি। সে এক সময়ে মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিল বলে পরিচয় দিচ্ছে। সে যা বলছে তা কি সত্যি ?

অপেক্ষা করুন।

আবার চুপচাপ। তারপর যন্ত্র হঠাৎ গুণকে চমকে দিয়ে বলে ওঠে, না।

মানে ?

সত্যি নয়। সুসি নামে কেউ মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিল না।

নাম হয়তো বানিয়ে বলছে।

চেহারার বর্ণনা দিন।

মোটামুটি লম্বা, চমৎকার গঠন, সুন্দর মুখশ্রী, গায়ের রং বাদামী, তার মাথায় লম্বা চুলের মস্ত গোছা, যৌন ক্ষুধাতুর, কিন্তু কুমারী, বয়স কুড়ি।

অপেক্ষা করুন।

গুণ অপেক্ষা করে।

একটু বাদে যন্ত্র বলে, আপনি আপনার সামনে টিভির সুইচ টিপুন।

টেলিফোনের সামনেই ঘষা কাচের পর্দা, নীচে বোতাম। গুণ বেতাম টিপতেই পর্দা উদ্ভাসিত হল আলোয়। তারপর নানারকম রেখার ঢেউ। আস্তে আস্তে রেখাগুলো স্থির হতে লাগল। ক্রমে রেখায় ফুটে উঠল একটি নগ্ন মেয়ের স্কেচ।

যন্ত্র বলে ওঠে, আপনার বর্ণনা অনুসারে আমাদের কমপিউটার এই স্কেচটি করেছে। মেয়েটি এ রকম কিনা দেখুন তো।

গুণ দেখে। অনেকক্ষণ দেখে। না, মেলেনি, হুবহু মেলেনি।

গুণ বলে, না, মুখটা আর একটু লম্বা হবে। চোখ আরো বড় এবং সরল।

অপেক্ষা করুন।

পর্দা সাদা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার রেখার ঢেউ আসে। জমাট বাঁধে।

আবার একটি মেয়ের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে।

যন্ত্রের গলা বলে, এবার দেখুন।

এখনো মেলেনি। গুণ আবার কয়েকটা সংশোধন করে। আবার পদা সাদা হয় এবং একটু বাদে আবার একটা মেয়ের ছবি আসে।

এইভাবে কয়েকবার চেষ্টার পর মোটামুটি সুসির চেহারা পর্দায় এলো।

হ্যাঁ, অনেকটা এ রকম।

অপেক্ষা করুন।

যন্ত্র-চুপ করে যায়। গুণ অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। যন্ত্র এবার অনেকক্ষণ সময় নেয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, আপনি সাবধান থাকবেন।

কেন ?

এ মেয়েটি সুসি। মেরু শহর পোলারিস-এর বাসিন্দা। কিছুদিন আগে সেখানে সবুজ খুনী নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি হয়। এরা অত্যন্ত চরম-পন্থায় বিশ্বাসী। এ মেয়েটি সেই দলের।

গুণ চমকে যায়। মেয়েটিকে ও রকম কিছু ভাবা তার পক্ষে শক্ত।

গুণ বলে, মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু বলুন।

দেখছি।

যন্ত্র চুপ। অনেকক্ষণ বাদে বলে, সে দোলনায় মানুষ হয়েছে। বাপ মা কে তা অজানা। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বভাব শীতল ও নিষ্ঠুর। কখনো ছোট-খাটো দুষ্টুমী করত না, খুব শান্ত থাকত। কিন্তু বাচ্চাবেলায় সে কীটপতঙ্গ মেরে ফেলত। একটু বড় হয়ে সে জীবজন্তু মারতে খুব ভালবাসত। সে কখনোই যৌনকাতর নয়। বরং ও ব্যাপারে তার তীব্র বিতৃষ্ণা আছে।

সে কি !

আমরা আপনাকে যথাযথ তথ্য দিচ্ছি।

কিন্তু সে যে প্রথমেই আমার কাছে শরীর চেয়েছিল।

যন্ত্র জবাব দেয়, সেজন্যই আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে। মেয়েটির সব কথা বিশ্বাস করবেন না। দোলনার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সুসি কোনদিনই যৌনমিলনে আগ্রহী হবে না। বরং ও রকম কিছু ঘটতে

গেলে সে বিদ্রোহ করবে, হিংস্র হয়ে উঠবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টায়।

আর কিছু জানাবার আছে?

যন্ত্র খানিকক্ষণ বাদে বলে, মেয়েটি পাগল বা মনোরোগী বলে চিহ্নিত নয়। তবে তার কতকগুলো বিশেষত্ব আছে। সে একা থাকতে চায় না। মৃত্যুভয় প্রবল।

সে কি কাউকে কখনো খুন করেছে?

করলেও রেকর্ড নেই। তবে কাজটা তার পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক।

সুসি ঘুমের ওষুধের গাঢ় নীল শিশিটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখে। শিশিতে খুব বেশী বড়ি নেই, দুটো কি তিনটে।

তাহলে গুণ নামে এ লোকটাও আর দশজন লোক যেমন হয় তেমনিই। অর্থাৎ স্বাভাবিক ঘুম এরও নেই। পৃথিবীর খুব কম লোকই স্বাভাবিক ভাবে ঘুমোয়, যাদের আপনা থেকে ঘুম আসে তারা বড় ভাগ্যবান।

সুসি শিশিটা রেখে দেয়। সে এক্ষুনি ঘুমোবে না। তার কাজ আছে।

কাচতন্তুর স্বচ্ছ দেয়ালের ধারে এসে সে দাঁড়ায়। এখন গ্রীষ্ম-কালের মেঘহীন আকাশ। পশ্চিমে এখনো ডুবে যাওয়া সূর্যের রক্তিম আভা একটুখানি আকাশের নীচে লেগে আছে, ভারী সুন্দর ঐ ক্ষীণ আভাটুকু।

সুসি সতর্ক চোখে দেখল, গুণ রাস্তা ধরে খানিক এগোল। থামল, কি ভেবে ফিরে এলো বাসার দিকে। ভাবল। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পাতালে নামবার সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল।

সুসি ঘড়ি দেখেছে। সাতটা বাজতে তিন মিনিট সাত সেকেণ্ড।

আকাশে এখনো অজস্র বাতাসগাড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে। যত রাত বাড়ে, তত বাতাসগাড়ির চলাচল কমে যায়। এখনো তেমন রাত হয়নি।

সুসি আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপল। স্বচ্ছ দেয়ালের ওপর একটা পর্দা পড়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে সুসি গুণের বাসাটা দেখে।

একটা ঝকঝকে মরিচাহীন ইস্পাতের শীট দিয়ে তৈরি আয়নার

সামনে দাঁড়াল সুসি। অনেকক্ষণ সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটুকুর মধ্যেই সে শেষ। তার শরীরের চারদিকে এই যে সুন্দর সাজানো ঘর, ঘরের বাইরে যে পৃথিবী, এত মানুষজন চারদিকে—এর কোনটার সঙ্গেই তার বনিবনা নেই, সম্পর্ক নেই, আদান প্রদান নেই। সামান্যই তার বয়স। এখনো পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থাকতে হবে। এবং সে বেঁচে থাকা হবে বড় একা একা।

আয়নার সামনে থেকে সরে আসে সুসি। ধীর পায়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে। তেমন কিছু দেখার নেই। বসবার ঘরে একটা ভূয়ো বুক কেসের পিছনে সে একটা টিভি ট্র্যান্সমিশন ক্যামেরা দেখতে পায়। খুব বেশী লোকের বাড়িতে এ জিনিস থাকে না। গুণের আছে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে গুণ বহু দূর থেকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে পারে।

সুসির কাছে এ সব যন্ত্র খেলনার মত সহজ। সে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরাটিকে অকেজো করে দিল।

দেয়ালের মধ্যে প্রোথিত একটা ওয়ার্ডোব খুলে সুসি দেখতে পেল অন্তত কুড়ি রকমের মেয়েদের পোশাক সাজানো রয়েছে। বেশীর ভাগই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত পোশাক—যা পরলে শীতকালে শীত বা গ্রীষ্মে গরম লাগে না। রয়েছে আগুন ও জল নিরোধক কাচতন্তুর পোশাক।

সুসি খুব সাদামাটা নাইলনের একটা রোব বের করে পরল। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা পড়ে গেল তার।

রান্নাঘরে এসে সে দেখে বহুকাল রান্নাবান্না কেউ করেনি এখানে। ঝকঝকে হিটার, বাসন কোসন, যন্ত্রপাতি সব সাজানো। ধুলো, বাতাস, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত এই ঘরেও সব কিছুর ওপর পাতলা ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘরটিতে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে, কয়েকটা পিঁপড়েও দেখতে পায় সুসি।

একধারে একটা ছোট্ট দরজার ওপরে লেখা : দি ফ্রোজেন গার্ডেন।

দরজাটা খুলে সুসি ভিতরে ঢুকে যায়।

লম্বা একটা গলি। দু' ধারে র‍্যাক সাজানো। তাতে অজস্র সতেজ সব্জী ফলে আছে রাসায়নিক একটা স্তরের কৃত্রিম ক্ষেতে।

এসব সব্জীর তেমন কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে কাজ চলে যায়। ইচ্ছে করলে আরক মিশিয়ে কৃত্রিম উপায়ে স্বাদ গন্ধ তৈরি করে নেওয়া যায়।

সুসির খিদে পায়নি, রান্নাও সে করবে না। সে শুধু ঘুরে ঘুরে দেখে।

কি দেখতে চাইছে তা সুসি জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে এই কৃত্রিম সব্জীবাগান দেখে ক্লান্ত সুসি ফের রান্নাঘরে চলে আসে। চট্‌ জলদি কফির একটা যন্ত্র রয়েছে।

সুসি চাবি দিতেই আধ মিনিটের মধ্যে এক কাপ ফুটন্ত কফি পেয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সুসি রেকর্ড ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেডিও টেপ-এর গুদাম বলা যায় ঘরটিকে। দেয়ালের গায়ে অজস্র চৌখুপীতে সাজানো টেপ। প্রত্যেকটা খোপের গায়ে ইলেকট্রনিক টাইপ দিয়ে লেখা কোনটা কোন বিষয়ের টেপ। একটা খোপের গায়ে লেখা আছে : আমার কথা। সুসি টেপটা প্রক্ষেপণ যন্ত্রে লাগিয়ে দিয়ে যন্ত্রটা চালু করে।

একটা টেলিভিশন যন্ত্রে ছবি ফুটে ওঠে :

গুণ তার বসবার ঘরে একটা কৌচে এলিয়ে বসে আছে। মুখখানা বিষণ্ন।

গুণ আস্তে আস্তে বলে, আমি আজকাল মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত চিন্তা করি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে, এই সম্পূর্ণ বান্ধবহীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের একজন ভালবাসার লোক

চাই-ই। ভালবাসা কথাটা পুরোনো এবং সম্পূর্ণ অচল। আমরা জানি কেবল কর্তব্য এবং উপভোগই শেষ কথা। ভালবাসা একটা ভাবাবেগ মাত্র। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের বিষয়, মানুষের অন্তর্গত সেই ভাবাবেগের শুষ্ক নদীখাতে মাঝে মাঝে প্লাবনের ঢল নামে।··· আমার স্ত্রী প্রকৃতি আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমার কত নম্বর স্ত্রী ছিল সেটা কথা নয়। কিন্তু কথা হল, তাকে চলে যেতে হল।

সুসি কফি খায়, একটু হাসে, শ্বাস টানে।

পর্দায় গুণ ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ তুলে বলে, এটা কোন ঘটনাই নয়। আমরা ক্রমে বিবাহহীন সমাজের দিকে এগোচ্ছি। কারও অন্য কোন মানুষ বা মেয়েমানুষের ওপর বিন্দুমাত্র দখলদারী থাকবে না। সমাজ মুক্ত হবে। পরিবারের বন্ধন থাকবে না। আমি এর বিরোধী নই, কুপ্রথা দূর হওয়াই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন অন্য। মানুষ তার মরা নদীর এই অহেতুক বান কি করে সামলাবে ?

সুসি নড়ে চড়ে বসে।

গুণ বলে, আমি অফিসে আটঘণ্টা পরিশ্রম করি, তার যথাযোগ্য প্রতিদানও পাই। আমার কিছুই পাওয়ার নেই আর। প্রকৃতির বদলে আজই আমার ঘরে আরও সুন্দরী মহিলার সমাগম ঘটতে পারে আমি ইচ্ছে করলেই। তবু এক মরা গাঙ আজ আমাকে কেন ডুবজলে নামিয়ে দিচ্ছে।

পর্দা সাদা হয়ে গেল একটুক্ষণের জন্যে। তারপর আবার ছবি আসে।

ভারী সুন্দর একটি অল্প বয়সের মেয়ে একটা কলের দোলনায় অল্প অল্প দোল খাচ্ছে বসবার ঘরে। মেয়েটির মুখে হাসি। ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গুণের গলার স্বর নেপথ্যে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, জাফরি। এ আমার সঙ্গে বাস করছে গত তিন মাস। তি-ন মা-আ-স! জাফরি নতুন দ্বীপের মেয়ে। ত্রিশ বছর

আগে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে উর্বর ও নতুন মাটি নিয়ে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটি ভেসে উঠেছিল জলের ওপর, তাতে বাস করার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে যে তিনশো পরিবার সেখানে যায়, জাফরির বাবা মা ছিল সেই দলে। ত্রিশ বছরের মধ্যেই নিউ আইল্যাণ্ড এক স্বাধীন ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই দ্বীপ-রাষ্ট্রকে বলা হয় ড্রিমল্যাণ্ড। সেখানে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। অভাব বোধ সেখানে শূন্য। গত শতাব্দীতে আমেরিকার যে ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছিল, নিউ আইল্যাণ্ডের খ্যাতি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। তবু সেখানকার মানুষ কতটা তৃপ্ত? জাফরিকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।

জাফরি! গুণ ডাকল।

হুঁ! ভারী সুন্দর মুখের ভাব করে জাফরি জবাব দেয়।

নিউ আইল্যাণ্ড জায়গাটা কেমন?

নতুন দ্বীপ, ভীষণ ভালগার।

কেন?

বোরিং।

কেন?

আমরা সেখানে যা খুশি করতাম। ছেলেবেলা থেকেই।

কোন অভাব ছিল না? গুণ প্রশ্ন করে।

অভাব! চোখ বড় করে জাফরি তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, অভাব কী?

নিউ আইল্যাণ্ডে পাওয়া যায় না, এমন কোন জিনিসের নাম করতে পারো?

না তো! জাফরি অবাক হয়ে বলে, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বলে, কী আছে চাওয়ার?

তোমরা কি ভাবে বড় হয়েছ?

যেমন ভাবে সেখানে বড় হয়। যা খুশি করতাম। লেখাপড়া ছিল, খেলা ছিল, আর ছিল কত কিছু। নাচ গান হৈ হুল্লোড়।

তাহলে তুমি খুব আনন্দেই ছিলে!

ভ্রু কুঁচকে জাফরি বলল, আনন্দ! না। বড় একঘেয়ে।

জাফরি তুমি কখনও কাউকে খুন করেছে?

খুন! ওঃ, সেখানে সবাই সবাইকে খুন করতে চায়। করেও অনেকে। খুব সাধারণ ঘটনা সেটা।

শাস্তি হয় না?

হয়। রিফর্ম সেণ্টারে পাঠানো হয়।

তুমি খুন করোনি?

করেছি। তিনবার। খুব ছেলেবেলায় একটি ছেলেকে খুন করি রশ্মি বন্দুক দিয়ে। সে আমার সঙ্গে পিকনিকে যেতে চায়নি, কিন্তু আমি খুব চেয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে থাক। সেটা আমার দশ বছর বয়সে ঘটে। পনেরো বছর বয়সে আমি আমার এক সুন্দরী বন্ধুকে খুন করি। আমার ছেলে বন্ধুরা তার কাছে চলে যেত। সতেরো বছর বয়সে আমি সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লেখাই। পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোর জন্য পাইকারী হারে হত্যাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। খুব মজা ছিল তাতে। তৃতীয়বারে আমি এই সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে খুন করি। সেবার গ্রেনেড ছুঁড়ে একটা ক্লাব হাউসের প্রায় আড়াইশো মেয়ে পুরুষকে মেরেছিলাম।

গুণের চাপা গলা পাওয়া গেল। স্বগতোক্তির মত সে বলছে, মজা! নিউ আইল্যাণ্ডের সব মানুষই এই রকম। তাদের মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। তাদের কোন কাজের জন্য কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না। নিউ আইল্যাণ্ডের এই নিস্পৃহ দার্শনিকতা ক্রমশ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই মনোভাবকে বোঝার জন্যই আমি জাফরিকে আমার কাছে রেখেছি। প্রতিদিন আমি বুঝতে পারছি···

সুসি যন্ত্র বন্ধ করে দিল।

নিঃশব্দে সে উঠে এলো টেলিফোনের কাছে। কিন্তু যন্ত্রটা

ব্যবহারের আগে সে একটু পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল, এই টেলিফোনটার নেপথ্যে কোথাও রেকর্ডার লাগানো আছে। যা কথা হবে তাই দলিল হয়ে থাকবে।

সুসি খুঁজতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড ফুলদানীর মধ্যে আর একটা টেলিফোনের সন্ধান পেল যেটায় কোন গণ্ডগোল নেই। সংখ্যার বোতাম টিপে একটু অপেক্ষা করতেই ওপাশ থেকে একটা গমগমে পুরুষ গলা বলে ওঠে, বাজ বলছি।

আমি সুসি।

বল।

আমাদের চিহ্নিত লোকটি অপ্রকৃতিস্থ।

জানি। কী পেলে?

আমি তেমন কিছুই পাচ্ছি না। সুসি খুব উদার গলায় বলে।

ওপাশে পুরুষটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, ঠিক আছে, আলোটা নিভিয়ে দাও।

কথাটার মানে সুসি জানে। আলো নিভিয়ে দেওয়া মানে খুন করা। আর এটাই হবে সুসির সর্বপ্রথম খুন।

ফোন রেখে সুসি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। খুন করা তেমন কাজ নয়; তার দল বহুবার খুন করেছে। জাফরি নামে যে মেয়েটি একদা গুণের সঙ্গে ছিল সুসিও তারই দলভূক্ত।

আবার ইস্পাতের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় সুসি। সাদা চোখে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু হায়! কোন পুরুষই তাকে একটু আদরও করেনি আজ পর্যন্ত। এই এক দুঃখ ছাড়া সুসির কোন দুঃখ নেই। তবে একটা ভয় আছে। যখনই ঘুম আসে তখনই মনে হয় কেউ তাকে ঘুমের মধ্যে মেরে ফেলবে।

গুণ কখন ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কিনা তার কোন ঠিক নেই।

সুসি তার ডান পায়ের জুতো খুলে ছোট একটা অংশ হিল থেকে খসাল। অংশটা একটা ক্ষুদে ব্যাটারির মত দেখতে। খুবই সহজ

ব্যবহার করা। বোতাম টিপলে অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে ছ্যাঁদা করে দেয়।

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সে ইস্পাতের আয়নার ঠিক মাঝখানটা লক্ষ্য করে বোতাম টিপল। খুব সামান্য একটু ঝলকানি আয়নার বুকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। স্যুসি এগিয়ে দেখে, আয়নার মাঝখানে মটরদানার চেয়েও ছোট মাপের নিখুঁত একটা ছ্যাঁদা।

হাতের যন্ত্রটার দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকে স্যুসি। এ রকম যন্ত্র নানা কাজে বহুবার ব্যবহার করেছে সে। কিন্তু খুনের জন্য এই প্রথম। যন্ত্রটাকে কেন যেন তার হাতে রাখতে ইচ্ছে হল না। বসবার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিল।

গুণ অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। লক্ষ্যহীন। সে বুঝতে পারছে, সুসিকে নিজের ঘরে স্থান দিয়ে সে বোধহয় ভাল কাজ করেনি। তার সামান্য ভয় করছিল।

যে দিনকাল পড়েছে তাতে ভয় করারই কথা। রাষ্ট্র নামে একটি মূক বধির প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে রাষ্ট্র কারও ওপরেই কোন নিয়ন্ত্রণ খাটায় না। ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন আগ্রহ নেই। মানুষ তার নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকে, নিজের দায়িত্বেই মরে। তাতে রাষ্ট্রের আহ্লাদ বা শোক নেই। সরকারী কাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চালায় অত্যাধুনিক কমপিউটার যন্ত্র। যে সব যন্ত্রের মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় নেই। বাজেট তৈরি করে যন্ত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করে যন্ত্র, কোথায় কোন প্রকল্প হবে বা হবে না সে সিদ্ধান্তও যন্ত্রই নেয়। এ রকম যান্ত্রিক সরকারের কাছে মানুষ কতদূর কী আশা করতে পারে?

ভূগর্ভ স্টেশনে ট্রেণ ধরে গুণ বহুদূর চলে গেল, আবার ফিরে এলো। তারপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা স্টেশনে নেমে সে সোজা টেলিফোন বুথে চলে যায়। নম্বরের বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু বাদেই ওপাশে একটা গলা বলে ওঠে, সংবাদ বিভাগ।

আমি গুণ। পুরোনো তথ্য বিভাগে কাজ করি।

বলে যান।

গুণ একটু দ্বিধা করে বলে, আমার খুব বিপদ।

কি রকম বিপদ?

ঠিক জানি না। তবে আজ বিকেলে সুসি নামে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে জুটে গেছে। মনে হচ্ছে তার কোন উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের কী করার আছে? আপনি রক্ষীদলকে খবর দিন।

গুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি একটু ভুল বুঝছেন। আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নই।

তবে?

যে যুগে এবং যে সমাজে বাস করছি তাতে যে কোন সময়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। সে জন্য মনে মনে প্রস্তুত আছি। মরতে ভয় পাই না, তা নয়। তবে মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তো পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

পৃথিবী! পৃথিবী নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই। কেউ পৃথিবী নিয়ে ভাবে না।

আমি ভাবি। স্বীকার করছি আমার মধ্যে কিছু সনাতন প্রবণতা আছে। আমি দুর্বল মনের মানুষ।

ওপার থেকে সামান্য হাসির শব্দ আসে। ভরাট গলায় জবাব পাওয়া যায়, আপনার ভাবনা কি নিয়ে?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

কি জানতে চান?

টিপসি যা বলেছেন তাতে মনে হয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খুবই বিষণ্ণতায় ভরা। মানুষ আরো হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে। পাপে ভরে যাচ্ছে দেশ।

তা তো ঠিকই। টিপসি ঠিক কথাই বলেন।

আমি কিছু আশার কথা শুনতে চাই।

আশার কথা যদি কিছু না থাকে?

গুণ হতাশ গলায় বলে, তাহলে আমার মৃত্যু ঘটবে চূড়ান্ত দুঃখবোধের মধ্যে।

মেয়েটি কি আপনাকে খুন করতে চায়?

জানি না। তবে সেটা সম্ভব।

ওকে ধরিয়ে দিন।

লাভ নেই। ও একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য। ওকে ধরিয়ে দিতে পারি বা হত্যাও করতে পারি। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। ইচ্ছে করলেই ওরা আমাকে যখন তখন মেরে ফেলতে পারে।

আপনার সন্দেহ অমূলক নয় তো!

অমূলক হলে ভালই। কিন্তু আজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময়ে আমি দেখি আমার বাতাসগাড়ির গ্যাস ট্যাঙ্কে একটা ফুটো। বোধ হয় কেউ ইচ্ছে করেই এই কাণ্ডটা করেছে। যাতে আমি ভূগর্ভ ট্রেণ বা অন্য কোন যানবাহনে চড়তে বাধ্য হই।

তাতে সুবিধে কী?

আমাকে অনুসরণ করার জন্য সেটা দরকার ছিল। হয়তো পথের মধ্যেই কোথাও ওরা আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল।

আপনি অনুমান করছেন।

করছি। কিন্তু অনুমানটা মরে যাওয়ার আগেই করা ভাল, নইলে পরে তো সময় পাওয়া যাবে না।

আপনার বাড়ির নম্বর এবং চ্যানেল বলুন।

গুণ চমকে উঠে বলে, কেন?

আপনার ঘরে যদি রিভার্স টেলিভিশনের ব্যবস্থা থাকে তো আমরা মেয়েটিকে লক্ষ্য করব।

গুণ দ্বিধা করল, কিন্তু অবশেষে নম্বরটা দিয়ে দিল।

সামান্য অপেক্ষা করল গুণ। তারপরেই ওপাশ থেকে গলা পেল, আপনার ঘরের যন্ত্রটি কি খারাপ?

না তো! বিস্মিত গুণ বলে।

তাহলে সেটা কেউ বিকল করে রেখেছে।

একটা শীতল স্রোত গুণের মেরুদণ্ড স্পর্শ করে নেমে গেল।

গুণ বলল, ঠিক মত দেখুন।

ঠিকই দেখেছি।

হতাশ ভাবে গুণ বলে, যন্ত্রটা লুকোনো রয়েছে। চোখে পড়ার কথা নয়।

কেউ খুঁজে বের করেছে। মেয়েটির পরিচয় কিছু জানেন ?

কী জানব ? আজকাল কে-ই বা নিজের সঠিক পরিচয় দেয়। আর পরিচয় দেওয়ার আছেই বা কি ! আমি যেমন গুণ নামে এক-জন লোক, সেও তেমনি সুসি নামের একটি মেয়ে।

ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর বলে, আপনি যেখান থেকে কথা বলছেন সেখানে রিভাস ক্যামেরা আছে ?

আছে।

সুইচ অন করুন। আমরা আপনাকে দেখতে চাই।

গুণ টেলিফোন বুথের দেয়ালে ক্যামেরার লেন্সটার পাশে ছোট্ট একটা বোতাম টিপল। যতদূর সম্ভব লেন্সের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল।

একটু বাদে কণ্ঠস্বর বলল, হ্যাঁ। আপনি গুণ। এর মধ্যেই আমরা আপনার সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়ে এসেছি। আপনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।

আমার ভয়টাও সত্য।

হতে পারে ! তবে আমরা নিঃসন্দেহ নই। ওরা আপনাকে কেন মারতে চায় তা জানেন ?

না। আজকাল লোকে অকারণেও লোককে মারে।

তা সত্য। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না ? যে কোন সম্ভাব্য কারণ ?

না।

আমাদের কাছে আপনি কী জানতে চান ?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন।

গুণ অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ। তারপর সামান্য একটু যান্ত্রিক শব্দ হয়।

হঠাৎ একটি থমথমে গলা বলে ওঠে, গুণ, আপনার পরিচয় আমি জানি, আপনি যা জানতে চান তাও। বলেই কণ্ঠস্বর থেমে যায়!

মৃদুস্বরে গুণ বলে, দয়া করে জবাব দিন।

ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। থমথমে গলাটি যেন অনেক দূরে সরে গিয়ে বলে, মানুষের সামনে কোন পথ খোলা নেই।

নেই?

আপাতত নেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জীন নষ্ট করে গেছেন। সেই মহতী বিনষ্টির বোঝা আমাদের বইতেই হবে!

কী ভাবে পূর্বপুরুষরা আমাদের জীন নষ্ট করলেন?

যথেচ্ছ বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন করে।

ইচ্ছাই তো বিবাহের মূল, তবে তা যথেচ্ছ হলে দোষ কী?

বংশধারা নষ্ট করে যে ইচ্ছা তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাঁরা বিবাহ বা মিলনের ক্ষেত্রে বর্ণ মানতেন না, রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা ছিল না। তাছাড়া ছিল কামভিত্তিক বিবাহের ফলে অতৃপ্তি, বিচ্ছেদ, অস্থিরতা—যা মানুষের ভিতরে নিরাপত্তার বোধ ও ভালবাসা নষ্ট করে দেয়।

মানুষের আবার বর্ণ কি? সবাই সমান।

এ হল প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা। মানুষ সবাই সমান নয়, হতে পারে না। শ্রেণীভেদ আছে এবং থাকবে, নিজের বৈশিষ্ট্য ভাঙা উচিত নয়। উল্টো পাল্টা প্রজননের ফলে মানুষের জীন বিনষ্ট হয়েছে। এখন আমরা কেবল উন্মার্গগামী, পাগল, নিষ্ঠুর ও নিঃসঙ্গ মানুষের দেখা পাচ্ছি। এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। মৃত্যু ছাড়া অন্য পরিণতি নেই।

সব অন্ধকার?

না, তা নয়। প্লাবনে সব ভেসে গেলেও কোথাও কিছু অঙ্কুর থেকে যায়, বীজ থেকে যায়।

সে রকম কিছু আছে?

থাকতে পারে।

আপনি নিশ্চিত কিছু বলতে পারেন না?

না, যদি কয়েকটা মাত্র সুপ্রজনন মানুষ ঘটাতে পারে, যদি কয়েকটি মাত্র স্নেহশীল নারী ও পুরুষের জন্ম হয় তাহলেও আশা আছে।

গুণ চুপ করে যায়, একটু পরে বলে, আমি হয়তো আজ রাতে মারা পড়ব। তার আগে এই আশার কথাটুকু আমার জানা দরকার ছিল।

দূরাগত গলা বলল, কত লোককে হত্যা করার জন্য কত লোক ওঁৎ পেতে রয়েছে।

গুণ সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মানুষ, না যন্ত্র?

সামান্য হেসে ওপারের গলা বলে, মানুষের ভালর জন্য কিছু লোক এখনো কাজ করছে। যন্ত্রের প্রভাবে তারা এখনো যন্ত্র হয়ে যায়নি।

অনেক ধন্যবাদ।

শুনুন, যে মেয়েটি আপনাকে হত্যা করার জন্য আপনারই ঘরে অপেক্ষা করছে তার জন্ম মোটামুটি ভাল।

সে কে?

তার বাবা মা ছিল সুখী দম্পতি। গত শতাব্দীর শেষে তাঁদের বিয়ে হয় পুরোনো প্রথায়, বর্ণাশ্রম মেনে। এই দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা বিবাহ-হীনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার কাজে নামেন। ফলে কিছু উগ্র আধুনিক মানুষ তাঁদের মেরে ফেলে। মেয়েটি সবই জানে কিন্তু বলে না।

গুণ বলে, আমারও জন্ম হয়েছিল সুখী দম্পতির কোলে। কিন্তু পরে যুগের প্রভাবে আমার বাবা মা বিচ্ছিন্ন হন।

সে সব আমরা জানি। আপনারা বর্ণে বৈশ্য।

গুণ চমকে ওঠে। বৈশ্য শব্দটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বর্ণাশ্রম বা পদবী এ আমলে লোপাট হয়ে গেছে। বর্তমানে মানুষ কেবল-মাত্র পদবীহীন নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়।

গুণ বলল, হ্যাঁ, সে কথা সত্যি।

ওপাশের মানুষ একটু হেসে বলে, সুসিও তাই। যদিও ওর দেশ ভিন্ন, কিন্তু বর্ণে ও আপনার গোষ্ঠীভুক্ত।

ও কি আমাকে মারবে ?

মারারই কথা।

তাহলে ?

কণ্ঠস্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, অন্যায়কে প্রতিরোধ করলে সব সময়ে লাভ হয় না।

আপনি কি বলছেন আমি বিনা প্রতিরোধে ওর হাতে খুন হতে দেবো নিজেকে ? তাতে কি লাভ হবে ?

দূরের স্বর একটু ভেবে বলে, যতদূর জানি এ মেয়েটি আগে কখনো খুন করেনি। যদি আপনাকে খুন করে তাহলে এই প্রথম। তবে এ মেয়েটির একটি মনোরোগ আছে। ও একা থাকতে ভয় পায়। আর এ রোগটা ওর পক্ষে খুবই উপকারী।

কেন ?

তার ফলে ও হয়তো ওর সঙ্গীকে মেরে ফেলার আগে সময় নেবে, সঙ্গ চাইবে। ও আপনাকে হুট করে মারবে না।

কিন্তু আমি কী করব ?

মানুষের কখন কী করা উচিত তা তার নিজেরই স্থির করা ভাল। বিশেষত আপনিও নিঃসঙ্গ এবং আপনিও মানুষকে নিয়ে ভাবেন। এবং আপনি কখনো কাউকে হত্যা করেননি।

কিন্তু এ মেয়েটি আমাকে খুন করতে চায় কেন ?

মেয়েটি চায় না, ওর দল চায়। আর খুন ওরা আপনাকে করবে কিছু একটা করার জন্যই। অন্যকে খুন না করলে ওরা নিজেরা যে বেঁচে আছে, তা বুঝবে কেমন করে ?

কেন যেন নিজেকে অপরিচ্ছন্ন লাগছিল সুসির। সে বাথরুমে গেল। আয়নায় নিজের দাঁত দেখে তার মনে হল দাঁতগুলো বড় অপরিষ্কার।

একটা অটোমেটিক টুথব্রাশ চালু করে সুসি। যন্ত্রটা তার মুখের মধ্যে সযত্নে ব্রাশ চালিয়ে ময়লা সাফ করে দেয়।

সুসি ঠাণ্ডা জলে স্নান করল ক্ষুদে সুইমিং পুলে নেমে। তারপর ড্রায়ার যন্ত্রের খোপে ঢুকে গায়ের জল শুকিয়ে নিল চোখের পলকে। সাজবার ঘরে ঢুকে একটা হেয়ার স্টাইলের যান্ত্রিক টুপি পরে নিল মাথায়। চুল আঁচড়ানো এবং সাজানো হয়ে গেল আপনা থেকেই।

সাদা রোব গায়ে ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে সুসি টের পায়, এ সব ঘরে বহু পুরোনো দিনের ঘাম, ধুলো, গন্ধ জমে আছে।

সাফাই যন্ত্রের চোঙ হাতে সে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য ময়লা আর নোংরা পরিষ্কার করতে থাকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরদোর ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

সুসি জানে, গুণের ফেরার সময় হয়নি। তার সন্দেহ, তাদের দলের সর্দার নীল গুণকে অনুসরণ করছে। সময় মত ঠিক সুসিকে সে খবর দেবে।

নীলের কথা ভেবে সুসি এখন একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়।

নীল হচ্ছে সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীন এক যুবক, বয়স সুসির মতই। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তার চোখ কুটিল, মন জটিল এবং নিষ্ঠুরতা সীমাহীন। ওর মত বুদ্ধিমান ও নোংরা দুটি মানুষ নেই। নীল কখনো সত্যি কথা বলো না। ওর মত বিশ্বাসঘাতকও দুটি নেই। মাত্র সাত বছর বয়সে নীল তার মায়ের চোখে ওষুধ দেওয়ার বদলে অ্যাসিড ঢেলে অন্ধ করে দেয়। নীল মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে,

হত্যার প্রেরণা দেয়। তার বন্ধু না থাক অনুগামী অনেক, নীল ঠিক নিজের ছাঁচে সবাইকে তৈরি করছে।

ভাবতে ভাবতেই ফোনে ডাক এলো।

সুসি ফোন ধরতেই নীলের বিরক্ত গলা ভেসে আসে : কী করছ সুসি ?

সুসি সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কিছু না।

রিভার্স ক্যামেরা চালু কর, আমি তোমাকে দেখতে চাই।

সুসি আদেশ পালন করে।

নীল তাকে পর্দায় দেখে বলে, তুমি স্নান করেছ ?

করলাম।

আর কী ?

ঘর দোর সাফ করলাম।

ঘর তোমার নয়। কেন পরিষ্কার করছ ?

এমনি।

বিরক্ত নীল বলে, তৈরি থাক। গুণ এখন দু'নম্বর সেকটরে। বাড়ি ফিরছে। ও আমাদের সম্পর্কে সব খবর নিয়েছে। ও যে তোমার হাতে খুন হবে তাও জানে। সুতরাং ওকে মারতে কোনো আনন্দ পাবে না তুমি, মরতে ও প্রস্তুত, ভয় পেও না। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রশ্মি চালাবে। দু' সেকেণ্ডও দেরী করবে না। বাইরে আমি বাতাসগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, তুমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেই তুলে নেবো।

ও যদি খারাপ লোক না হয়ে থাকে ?

তবু মারবে। আমরা মৃত্যু দণ্ডাদেশ ফিরিয়ে নিই না। তাছাড়া তোমার প্র্যাকটিসের জন্যও এ লোকটার মরা দরকার। আজ রাতে তোমার প্রথম খুন উপলক্ষে আমরা উৎসব করছি।

ফোন নিশ্চুপ হয়ে যায়।

সুসি উঠে রান্নাঘরে আসে। আবার কফি তৈরি করে। আস্তে

আস্তে কফি খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে, গুনগুন করে গান গায়। একটু বাদেই তাকে জীবনের প্রথম খুনটা করতে হবে, এ কথা তার মনেই হয় না।

রাত হচ্ছে, সুসির খিদে পেয়ে যায়। অল্প দূরেই রেস্তোরাঁ রয়েছে। ফোন করে দিলেই ইলেকট্রিক ট্রলি বোঝাই খাবার চলে আসবে। সে নিজেও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসতে পারে। কিন্তু একাকীত্ব কাটানোর জন্যই সুসি আবার রান্নাঘরে চলে আসে।

মাত্র দশ মিনিটেই স্বয়ংক্রিয় এক রাঁধুনী যন্ত্র তার জন্য সুস্বাদু তিন চার রকমের খাবার প্রসব করে। রান্নার সময় সুসি রাঁধুনী যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই রান্নাঘর এর আগে আর কেউ ব্যবহার করেনি। যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আনকোরা রয়েছে।

সুসি পেট ভরে খেল। খাওয়ার সময়ে সে টের পেল, বহুক্ষণ সে কোন কিছুই খায়নি। বড় বেশী ক্ষুধাতুর ছিল সে। পেট ভরার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে আর মনে কিছু পরিবর্তন আসে। ভারী স্নিগ্ধ লাগে। মন এবং শরীর ক্রমশ অলস হয়ে পড়ে।

সুসির গান শুনতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু যন্ত্রের গান নয়, সাদা গলার গান। ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার মন খুব চনমন করতে থাকে। ভারী ব্যাকুলতা বোধ করে সে। তার হাতে একটা সাজ্ঘাতিক কাজের দায়িত্ব রয়েছে, সে কথাও মনে পড়ে। রশ্মিযন্ত্রটা যে কোথায় রাখল সে!

চারদিকে একবার চাইল সে, কিন্তু তেমন করে খুঁজল না। এক্ষুনি দরকার নেই। আসলে সে নীলের আদেশ মানবে না। গুণকে সে এক্ষুনি খুন করতে চায় না। একটু ভাব করতে চায়, কথা বলতে চায়। তারপর অবসর বুঝে যন্ত্রের বোতাম টিপলেই হল।

কখন একটা কৌচে বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সুসি। মুখখানা অল্প হাঁ করা, বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে এলায়িত শরীর, চুলের

গুচ্ছ মেঝে ছুঁয়েছে। সে টেরও পায়নি কখন নিঃশব্দে দরজা খুলে গুণ ঢুকেছে ঘরে।

যখন চমক ভাঙল তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সামলানোর সময় নেই।

এ লোকটাকে কী যেন করতে হবে, বলেছিল নীল! কিছুতেই মনে পড়ছে না যে! ঘুমের নেশায় মগজ বড় এলোমেলো। কফিতে কিছু মেশানো ছিল কি?

সুসি উঠে বসে দেখে, সামনে গুণ দাঁড়িয়ে। স্তম্ভের মত স্থির। অকপট চোখে তাকেই দেখছে। কতক্ষণ এসেছে ও?

বাইরে একটা আকাশগাড়ির দীর্ঘ হর্ণ শোনা গেল। অধৈর্যের ইশারা! নীল নিশ্চয়ই। হর্ণ দিয়ে বলতে চাইছে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে এসো।

সুসি উদভ্রান্তের মত ওঠে।

সামান্য বিষণ্ণ হেসে গুণ বলে, তাড়া নেই।

সুসি অবাক হয়। এ লোকটা তাকে কী ভীষণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ বিকেলে! এখন বলছে, তাড়া নেই।

সুসি চারদিকে চেয়ে তার রশ্মিযন্ত্রটা খুঁজল। দেখতে পেল না। কোথায় গেল সেটা।

গুণ পোশাক পাল্টাল না। সুসির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, এতক্ষণ কেমন কাটল?

যেমন রোজ কাটে। একা।

তোমার কেউ নেই?

না।

আমারও না।

এ কথায় সুসির অল্প একটু অভিমান হয়। সে তো আগেই বার বার বলেছে একে যে, সে কত একা! সে কথা কি ও আগে শোনেনি? না কি গ্রাহ্য করেনি?

গুণ খুব সতর্কভাবে চারদিকে চেয়ে বলল, তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?

সুসি হেসে ফেলল, আমি কিছুই নিয়ে আসিনি। সে তো তুমি দেখেছ !

কিছু না ?

সুসি সামান্য কেঁপে গেল ভিতরে ভিতরে। ও কী বলতে চায় ? মাথা নেড়ে সুসি বলে, আমার কিছু নেই।

হৃদয় ?

ও সব কুসংস্কার। পুরোনো ঠাট্টা কোরো না।

গুণ আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একটু দূর গলায় বলে, সুসি, আমি প্রতিরোধহীন। পৃথিবীতে কেউ নিরাপদ নয়।

সুসি চুপ করে থাকে। বাইরে বাতাসগাড়ি হর্ণ দিচ্ছে।

গুণ শোওয়ার ঘরে যায় এবং বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলে, সুসি, ঘুমের মধ্যে মরতে আমার ভয় নেই।

সুসি ভ্রূ কুঁচকে ভাবে। বাতাস গাড়ির হর্ণ তাকে ঘন ঘন তাগাদা দিতে থাকে।

সুসি ওঠে। ধীরে ধীরে সে সারা ঘর খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল তার রশ্মিযন্ত্র ?

অনেকক্ষণ বাদে তার মনে পড়ে। সে গিয়ে সাফাই যন্ত্রের চোঙটা আলোয় তুলে দেখে। চোঙের ভিতরে ধাতব ছাঁকনিতে রশ্মিযন্ত্রটা আটকে আছে। যন্ত্রটা খুলে আনে সুসি। তারপর হাতে নিয়ে দেখে, বেঁকে চুরে অকেজো হয়ে গেছে রশ্মিযন্ত্র।

সুসি ছুঁড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রটা।

বাইরে নীল ডাকছে। কিন্তু বেশীক্ষণ ডাকবে না। আকাশে গোয়েন্দা পুলিশের ট্রেমার মডিউল ঘুরছে।

সুসি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মস্ত চুলের গোছাটা হাতের আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে সুসি আপনমনে বলে, একদিন

যন্ত্রই যন্ত্রকে খাবে। সব খেয়ে ফেলবে। সেদিন আমরা সুখে থাকব।

নীল ঘরে ঢুকল না।

গুণ ঘুমিয়ে রইল। সুসি রইল সারা রাত পাহারায়।